বৌবাজারের বৌদি
নিমাই ভট্টাচার্য

গল্পক্রম
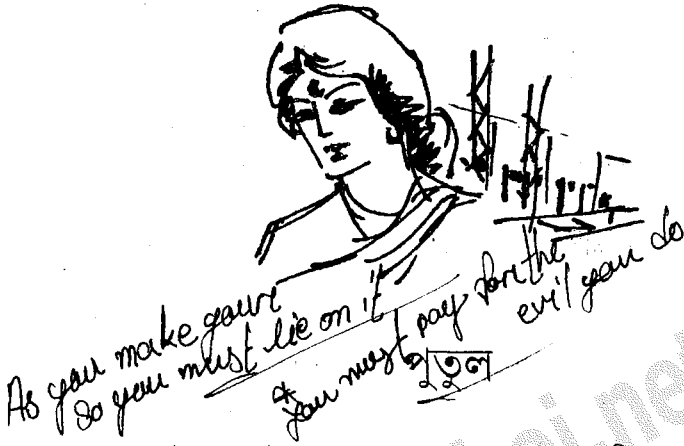
এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেন নি।

পৌনে ন'টায় মাদ্রাজ মেল ছাড়বে কিন্তু তার প্রায় ঘণ্টা খানেক আগেই বিমলবাবু তার স্ত্রী পুতুল আর মেয়ে তাতাইকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যান। শুধু যানজটের ভয়ে না, বোধহয় বেড়াতে যাবার আগ্রহের আতিশয্যেই ওরা অত আগে স্টেশনে হাজির হন।

বিয়ের আগে বিমলবাবু একটু বাউণ্ডুলে ধরনের ছিলেন। কবে যে উনি কোথায় যাবেন আর কখন কোন চাকরি ধরবেন-ছাড়বেন, তা কেউ জানতো না। ছাব্বিশে জানুয়ারী শুক্রবার ছুটি। তার সঙ্গে শনি-রবিবারের ছুটি। ব্যস! পঁচিশে রাত্তিরেই বিমল পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে বলে যায়, মা, আমি সোমবার সকালে পুরী এক্সপ্রেসে ফিরব। বাড়ি এসে খেয়ে-দেয়েই অফিস ছুটতে হবে।

হ্যাঁরে বিমলু, সত্যি ফিরবি তো?

মা ছেলেকে খুব ভালভাবেই জানেন বলে প্রশ্ন করেন।

ফিরবো না মানে?

বিমল চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, সোমবার ঠিক দশটায় অফিসে না পৌঁছলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

মা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ, ফিরিস। আমাকে তাড়াহুড়ো করে রন্নাবান্না সেরে শুধু শুধু বসে থাকতে না হয়।

না, না, তোমাকে শুধু শুধু বসে থাকতে হবে না।

সোমবার না, বিমল ফিরে এলো পরের রবিবার।

কোন দুঃখ, আক্ষেপ বা অন্যায়বোধ তো দূরের কথা, ও হাসতে হাসতে বলল, জানো মা, পুরীতে গিয়ে হঠাৎ সজলের সঙ্গে দেখা। ওর পাল্লায় পড়ে পুরীতে মাত্র একদিন থেকেই চলে গেলাম চিল্কার পাড়ে বারকুলে।

মা গম্ভীর হয়ে থাকলেও বিমল মহানন্দে বলে যায়, বারকুলের টুরিস্ট লজ' এ ডিনার টেবিলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেবার পর জানলাম, উনি কেওনঝড়ের এস. পি।

বিমল দু'হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে বলে, ব্যস! ওর সঙ্গে ওরই গাড়িতে চলে গেলাম কেওনঝড়! গাছপালা-পাহাড় দিয়ে ঘেরা শহরটাকে আমার দারুণ ভাল লেগেছে।

দু'হাত দিয়ে মা'র মুখখানা ধরে বলে, তাছাড়া বৈতরণী নদীর উৎস আর তোমাদের রামায়ণের সেই বিখ্যাত গন্ধমাদন পর্বতও দেখে এলাম।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তোমাকে একবার নিয়ে যাবো। দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

ওর মা একটু হেসে বলেন, আমি কী তোর মত বাউণ্ডুলে যে ঘর-সংসার ফেলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে চলে যাবো।

শুধু সেবার নয়, বরাবর বিমল এই কাণ্ড করে। একবার বাড়ি থেকে বেরুল কাশী যাচ্ছি বলে। দু'দিন পর কাশীতে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হলো, কাশীর নানা অঞ্চলে বেশ কিছু টুরিষ্টদের মৃত্যুর খবর। বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। প্রায় দু'সপ্তাহ পরে হাসতে হাসতে বিমলের আর্বিভাব।

জানো মা, নৌকায় কাশী থেকে কানপুর যাবার সময় কি দারুণ অভিজ্ঞতা হলো, তুমি ভাবতে পারবে না।

তুই কী এতদিন কানপুরেই বসেছিলি?

আমি কানপুরে বসে থাকার মত ছেলে?

বিমল হাসতে হাসতে হাসতে বলে, একটা ছেলের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে চলে গেলাম নৈনীতাল। তারপর রানীক্ষেত কৌশানী বাগেশ্বর ঘুরে লক্ষ্ণৌ হয়ে ফিরে এলাম।

খুব মহৎ কাজ করেছিস। এদিকে আমরা যে চিন্তায় ভাবনায় পাগল হয়ে যাচ্ছি..

বিমল দু'হাত দিয়ে মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার মত মা যার,

তার ক্ষতি কে করবে?

এইরকম বেমক্কা বেহিসেবী ঘুরে ফিরে বেড়াবার জন্য ওকে চার-পাঁচবার চাকরি পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে কিন্তু তার জন্য ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ-আক্ষেপ হয়নি।

পুতুলকে বিয়ে করার পর বিমল একটু পালটেছে। গত সাত বছর ধরে একই কোম্পানীতে চাকরি করছে। তবে ক্যাজুয়াল লিভ, আর্ন লিভ আর মেডিক্যাল লিভের ষোল আনা সদ্ব্যবহার করে ঘুরে-ফিরে বেড়াবার জন্য।

আগে পুতুল মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলতো, তুমি যে কী করে ধৈর্য ধরে ক'টা বছর পড়াশুনা করে এক চান্সে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলে, তা আমি ভেবে পাই না।

এখনও পুতুল কখনও কখনও ঠাট্টা করে বিমলকে বলে, আমি চাকরি কি সাধে করি? তুমি যে কবে কোথায় কত দিনের জন্য উধাও হয়ে যাবে, তার কী কোন ঠিক ঠিকানা আছে?

ও একটু হেসে বলে, তখন মেয়েটাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে বলেই তো চাকরি করছি।

পুতুলও বেড়াতে ভালবাসে কিন্তু বিয়ের আগে শুধু শান্তিনিকেতন, দীঘা, পুরী আর দার্জিলিং ছাড়া আর কোথাও যায় নি। বিয়ের পর অবশ্য মাঝে মাঝেই বিমল ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কখনও দূরে, কখনও কাছে ; কখনও দু'চারদিনের জন্য, কখনও আবার দু'চার সপ্তাহের জন্য।

এবার ওরা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারত। প্রথমে মাদ্রাজ। সেখানে দু'চারদিন কাটিয়ে একদিন মহাবলীপূরম, কাঞ্চিপূরম আর পক্ষীতীর্থম ঘুরে এসে পরের দিনই যাবে পণ্ডিচেরী। তারপর ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরাই, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী ইত্যাদি ঘুরে-ফিরে চলে যাবে ব্যাঙ্গালোর। ওখানে দু'তিন দিন কাটিয়ে মহীশূর।

মোটামুটি কুড়ি-বাইশ দিনের ব্যাপার। বিমলের ইচ্ছা ছিল, এক মাসের পুরো ছুটিটাই বাইরে কাটায় কিন্তু পুতুল বলেছে, বাইরে থেকে ঘুরে-ফিরে এসেই আমি অফিস ছুটতে পারবো না। তাছাড়া তাতাইকে তো হোম টাস্ক শেষ করে স্কুলে যেতে হবে।

তবু বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, যদি তোমাদের মত হয়, তাহলেই ফেরার পথে চিল্কার পাড়ে দু'দিন বিশ্রাম করবো।

যাইহোক দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে বলে বিমল মহাখুশি। খুশি পুতুলও। আর তাতাই তো রীতিমত উত্তেজিত।

রিজার্ভেশন চার্ট দেখে এসেই বিমল বলে, জানো পুতুল, আমাদের কম্পার্টমেন্টে

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক যাবেন।

পুতুল একটু হেসে বলে, তার মানে তুমি প্রাণভরে আড্ডা দিতে পারবে।

আড্ডা দেব কখন?

বিমল মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ভদ্রলোক তো ভোরবেলাতেই নেমে যাবেন।

ভোরবেলায় মানে? কোথায় নামবেন?

বেরহামপুরে।

বিমল একটু থেমে বলে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গোপালপুর অন সী যাবেন।

একটু পরেই প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেয়। বিমল পুতুল আর তাতাইকে নিয়ে নিজেদের কম্পার্টমেন্টে ওঠে। মালপত্র ঠিকঠাক করে রাখে। তিনজনেই কোল্ড ড্রিঙ্ক খায়। বিমল সিগারেট কিনে আনে। ওদের কম্পার্টমেন্টের সামনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতেই বিমল চারপাশের মানুষের ব্যস্ততা দেখে।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ-সাত মিনিট আগে বিমল নিজেদের কম্পার্টমেন্টের ভিতরে পা দিয়েই পুতুলের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ চ্যাটার্জী বোধহয় যাবেন না বলেই মনে হচ্ছে।

কোন মিঃ চ্যাটার্জী?

আমাদের এই কম্পার্টমেন্টেই যার রিজার্ভেশন আছে।

ও!

পুতুল একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বলে, আর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তো ট্রেন ছাড়বে। ভদ্রলোক এলে এরই মধ্যে এসে যেতেন।

বিমল একটু হেসে বলে, ভদ্রলোক না এলেই ভাল হয়। উনি না এলে আমরা একটার জায়গায় দুটো লোয়ার বার্থ নিতে পারবো।

ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দু'তিনজন ভদ্রলোক ওদের কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে হাজির। ওদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বললেন, দাদা, এই যে এখানে!

ওদেরই একজন বার্থের নীচে একটা সুটকেশ আর একটা ব্যাগ রাখতেই পরণে স্যুট, মাথায় ফেলট ও চোখে কালো চশমা দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জী কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকলেন।

বিমল আর পুতুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঐ সুপুরুষ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দাদা, আপনার রাত্রে যা যা দরকার, তা সুটকেশ খুললেই সামনে পেয়ে যাবেন।

মিঃ চ্যাটার্জী একটু হেসে বললেন, ওরে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তোমরা নেমে যাও।

একজন এক গাল হেসে বললেন, আমরা ঠিক নেমে যাবো।

অন্য এক ভদ্রলোক বললেন, কাল স্টেশনে সবাই থাকবে। আমিও এখুনি ফোন করে বগীর নম্বর জানিয়ে দিচ্ছি।

ওরা আর কথা না বলে চলন্ত ট্রেন থেকেই নেমে যান।

মিঃ চাটার্জী মাথা থেকে টুপিটা খুলে পাশে রাখেন। তারপর আলতো করে চোখের কালো চশমাটা খুলতেই বিমল আর পুতুল চমকে ওঠে। ওরা দু'জনে বিস্ময়ে আনন্দে ও অভাবনীয় সৌভাগ্যের খুশিতে মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখে বাংলা সিনেমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক অর্জুন চট্টোপাধ্যায়কে।

হঠাৎ পুতুল কনুই দিয়ে আলতো করে গুতো মারতেই বিমল এক গাল হাসি হেসে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি তো বেরহামপুর যাচ্ছেন!

অর্জুন কি একটা কাগজ পড়তে পড়তে একটু মুখ তুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, একটু গোপালপুর অন সী যাবো।

বেড়াতে যাচ্ছেন?

অর্জুন একটু মাথা নেড়ে বলেন, না, ওখানে গিয়েও রং মেখে ক্যামেরার সামনে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে।

পুতুল আর চুপ করে থাকতে পারে না। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, ওখানে কোন ছবির সুটিং হবে?

খেলা ভাঙার খেলা।

অর্জুন পুতুলের চোখের উপর চোখ রেখেই উত্তর দেন।

ও হ্যাঁ!

পুতুল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই বলে, কাগজে পড়ছিলাম।

ও মুহূর্তের জন্য আবার বলেন, মোহিনী সেন আর বলাকা রায় তো দুই নায়িকা, তাই না?

অর্জুন মুখে কিছু বলেন না। চাপা হাসি হাসতে হাসতে শুধু মাথা নাড়েন।

বিমল বলে, আমার স্ত্রী তো আপনার অন্ধ ভক্ত! আপনার কোন ছবি ও বাদ দেয় না।

অর্জুন পুতুলের দিকে তাকিয়ে বলেন, তাই নাকি?

আপনার কোন কোন ছবি আমি আট-দশবার দেখেছি।

কী সর্বনাশ!

তাতাই আপনমনে 'শুকতারা' পড়ছিল। ও একবার মুখ তুলে সামনের বার্থের

ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই অর্জুন চোখ দুটো বড় বড় করে একটু সামনের দিকে ঝুকে জিজ্ঞেস করেন, কী নাম তোমার?

তাতাই।

বাঃ!

অর্জুন ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, যেমন সুন্দর তোমাকে দেখতে, সেইরকমই সুন্দর তোমার নাম।

উনি টাই'এর নট খুলতে খুলতে বলেন, জামাকাপড় বদলে নেবার পর তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

টাই খুলে পাশে রেখেই কোটটা খুলে ফেলেন। তারপর সুটকেশ খুলে পায়জামা-পাঞ্জাবি-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে যান।

বিমল সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে পুতুলকে বলে, তুমি তো আজ সারা রাত অর্জুনকে দেখবে। এক মিনিটের জন্যও তো ঘুমুতে পারবে না।

শুধু আজকের রাত কেন, আমি মাসের পর মাস ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারি।

ছোট্ট তাতাই হঠাৎ প্রশ্ন করে, মা, ইনি সিনেমা করেন, তাই না?

তাতাই'এর মাথায় হাত রেখে পুতুল বলে, সিনেমা করেন মানে? এর চাইতে কেউ ভাল সিনেমা করতে পারে না। তাইতো কোটি কোটি মানুষ ওকে ভালবাসে।

তাতাই গম্ভীর হয়ে হিসেব করে বলে, একশ' হাজারে এক লাখ; তারপর একশ' লাখে এক কোটি হয়, তত লোক ওকে ভালবাসে?

হ্যাঁ, মা, এত লোকই ওকে ভালবাসে।

অর্জুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ফিরে এসে প্যান্ট-সার্ট বার্থের এক পাশে রেখে টয়লেটারিজের ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা শিশি বের করে তাতাইকে বলেন, টাটাই, দেখি একটু স্প্রে করে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে ওর গায় স্প্রে করে দিয়েই অর্জুন নিজের পাঞ্জাবির উপর সুগন্ধ ছড়িয়ে দেন।

এবার বিমলের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলে, আপনাকে দিই?

বিমল এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, দিন।

ওর জামায় স্প্রে করার পর অর্জুন পুতুলকে বলে, আপনাকে?

পুতুল খুশির হাসি হেসে বলে, আপনাকে না বলার ক্ষমতা আমার নেই।

অর্জুন ওর শাড়ি-ব্লাউজে স্প্রে করে দিতেই পুতুল বলে, ভারী সুন্দর গন্ধ।

বিমল স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, উনি কী সাধারণ মানুষ যে সাধারণ জিনিষ

ব্যবহার করবেন।

অর্জুন বেনসন-হেজেস-এর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরায়। একটা টান দেয়। আপনমনে কি যেন ভাবেন।

তাতাই পুতুলের হাত ধরে একটু টান দিয়ে বলল, মা, খেতে দেবে না? বড্ড খিদে লেগেছে।

অর্জুন বললেন, তাতাই, তুমি স্যান্ডউইচ খাবে?

তাতাই কিছু বলার আগেই বিমল বলে, না, না, ওকে স্যান্ডউইচ দিতে হবে না। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে।

পুতুল বলল, আমাদের সঙ্গে লুচি-তরকারী-মিষ্টি আছে। আপনাকে একটু দিতে পারি?

অর্জুন ওর দিকে তাকাতেই পুতুল আবার বলে, সবই আমার নিজের হাতে তৈরি। আপনি একটু খেলে খুব খুশি হবো।

অর্জুন কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, আপনার নিজের হাতের তৈরি বলে একটা লুচি খাবো।

এখনই দেব?

না, না, পরে।

অর্জুন একটু থেমে বলেন, টাটাই' এর খিদে পেয়েছে। আপনারা খেয়ে নিন।

পুতুল খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করতেই অর্জুন বিমলের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার নামটা জানা হলো না।

আমার নাম বিমল চক্রবর্তী।

মিসেস চক্রবর্তী। আপনার নাম?

এক গাল হাসি হেসে উনি বলেন, পুতুল।

সত্যি আপনাকে পুতুলের মত সুন্দর দেখতে।

কথাটা শুনে পুতুল খুব খুশি হলেও বিমলের বিশেষ ভাল লাগে না।

সিগারেট শেষ করেই অর্জুন ব্যাগ থেকে শিভাজ রিগ্যালের বোতল, জলের ফ্লাক্স আর গেলাস বের করেই বলেন, বিমলবাবু একটু ড্রিঙ্ক করবেন?

না, না, আমি ড্রিঙ্ক করি না।

বোতলটা একটু তুলে ধরে উনি বললেন, প্রিমিয়াম স্কচ। খেলে বোধহয় ভালই লাগতো।

না, না, আমি খাবো না। আপনি খান।

অর্জুন গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়েই একটা সিগারেট ধরান। ওরাও খাওয়া-দাওয়া

শুরু করে।

দু' পাঁচ মিনিট পর অর্জুন ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়তে পড়তেই মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দেন। হঠাৎ কখনও কখনও মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত পুতুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

চোখে চোখ পড়তেই পুতুল দৃষ্টি গুটিয়ে নিলেও বিমল মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়।

এক গেলাস শেষ হতেই অর্জুন আবার গেলাস ভরে নেন। বই পড়তে পড়তেই গেলাসে চুমুক দেন। তাতাই এর দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। তারপরই কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে পুতুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বিমল অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে না।

আবার গেলাস খালি হয়, আবার গেলাস ভরে নেন অর্জুন। বই পড়তে পড়তেই সিগারেটে টান দেন। গেলাসে চুমুক দেন দু'পাঁচ মিনিট পর পরই। তারপর হঠাৎ আবার কয়েক মুহূর্ত পুতুলকে দেখেন।

পুতুল মনে মনে খুশি হলেও একটু অস্বস্তিবোধ না করে পারে না। একটু সহজ হবার জন্য বলে, এখন লুচিটা খাবেন?

পরে।

বিমল তাতাই আর পুতুলকে বলে, চলো, আমরা হাত ধুয়ে আসি।

হ্যাঁ, চলো।

বাথরুমের কাছে গিয়েই বিমল পুতুলকে বলে, তোমার অর্জুনের অসভ্যতা দেখছো?

উনি আবার কী অসভ্যতা করলেন?

নির্লজ্জভাবে তোমার দিকে কিভাবে তাকিয়ে...

পুতুল একটু জোরেই হেসে ওঠে। বলে, তুমি তো আচ্ছা পাগল! সামনা-সামনি বার্থে থাকলে সামনের লোকজনের দিকে না তাকিয়ে পারা যায়?

তাই বলে ঐ রকম অসভ্যভাবে...

আঃ কী যা তা বলছো!

পুতুল একটু থেমে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, অর্জুন চ্যাটার্জী তো জীবনে কখনও সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। তাই হ্যাংলার মত আমাকে দেখছেন।

মাতাল-চরিত্রহীন বলেই তো ভদ্রসমাজে ওদের জায়গা হয় না।

বিমল যতটা ঘেন্না ও বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলে, পুতুলও ততটাই অসন্তোষের সঙ্গে বলে, যার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, তার সম্পর্কে এভাবে

আজেবাজে কথা অন্তত আমাকে বলো না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, যারা অভিনয় করে না, তারা সবাই বোধহয় রামকেষ্ট পরমহংস, তাই না?

পরিস্থিতিটা একটু সামলে নেবার জন্য বিমল বলে, আমি কী তাই বলেছি?

পুতুল আর কোন কথা না বলে তাতাইকে নিয়ে নিজেদের কম্পার্টমেন্টে যায়। বিমলও দেরি করে না। ওদের প্রায় পিছন পিছনই যায়।

অর্জুনকে রিডিং লাইটের আলোয় বই পড়তে পড়তে হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতে দেখেই বিমল বলে, খালি পেটে ড্রিঙ্ক করছেন ; কিছু খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

অর্জুন উঠে বসে একটু হেসে বলেন, আমি তো আপনাদের লুচির ভরসায় বসে আছি।

সরি! সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেল।

পুতুল সলজ্জভাবে কথাগুলো বলেই তাড়াতাড়ি একটা প্লেটে দুটো লুচি, একটু আলুর দম আর একটা সন্দেশ দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই নিন।

অর্জুন প্লেটটা হাতে দিয়েই পুতুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, ক'টা লুচি দিয়েছেন?

মাত্র দুটো।

আমি যদি একটা লুচি খাই, আপনি কী অসন্তুষ্ট হবেন?

অসন্তুষ্ট হবো না, দুঃখ পাবো।

অর্জুন ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা নেড়ে চাপা হাসি হেসে বললেন, না, না, আপনাকে আমি দুঃখ দেব না। তবে প্লীজ সন্দেশটা তুলে নিন।

বিমল বলে, মাত্র একটা সন্দেশ দিয়েছে। ওটা খেয়ে নিন।

ভাই, আমি মিষ্টি খাই না।

পুতুল জিজ্ঞেস করে, আপনি একেবারেই মিষ্টি খান না?

অর্জুন আবার কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, নববর্ষ, বিজয়া আর জন্মদিনের দিন দিদিকে প্রণাম করার পর ওর হাতে একটা করে মিষ্টি খাই।

পুতুল সলজ্জ দৃষ্টিতে পরম প্রিয় অভিনেতার দিকে তাকিয়ে বলে, ভুল করে যখন দিয়েই ফেলেছি, প্লীজ খেয়ে নিন। সত্যি বলছি আপনার প্লেট থেকে কোন কিছু তুলে নিতে ইচ্ছে করছে না।

অর্জুন আপনমনে কি যেন ভাবেন। তারপর আলুর দম দিয়ে দুটো লুচি আর

মিষ্টি খেয়ে পুতুলকে বলেন, খুব ভাল খেলাম।

উনি বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে না আসতেই বিমল উপরের দুটো বার্থ আর নীচের বার্থে চাদর বিছিয়ে টিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলে।

অর্জুন কম্পার্টমেন্টে ঢুকেই বিমলকে বলেন, আপনি যখন ইচ্ছে আলো অফ্ করে দেবেন।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ভাবছি, এবার শুয়ে পড়বো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়ে পড়ুন

আপনি শোবেন না?

একটু পরে।

অর্জুন আবার গেলাসে হুইস্কী ঢেলে জল মিশিয়ে এক চুমুক দিয়েই শুয়ে শুয়ে রিডিং লাইটের আলোয় আবার বই পড়তে শুরু করেন।

উপরের দুটো বার্থে বিমল আর তাতাই চলে যাবার পর পুতুল নীচে বার্থে পাশ ফিরে শুয়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর কত কি ভাবেন।...

অন্ধকার সিনেমা হলে সামনের পর্দায় এই মানুষটার ছবি দেখলেই একটা আশ্চর্য খুশির বন্যা বয়ে যায় সারা মন-প্রাণে। একটা ছবি দেখার পর কিছুতেই রাত্রে ঘুম আসে না। চোখের সামনে শুধু মানুষটাকেই দেখি।...

না, না, শুধু দেখি না। মনে মনে কত কথা বলি ওর সঙ্গে। কখনও কখনও তো ওকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতেও ইচ্ছা করে।...

আরো, আরো কত কি!

সেই স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমারকে পুতুল অপলক দৃষ্টিতে দেখে। না দেখে পারে না।

অর্জুন পাশ ফিরে হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েই পুতুলের চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার বই পড়তে শুরু করে।

মিনিট দশেক পর অর্জুন আবার হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়েই দেখে, পুতুল তখনও অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় পুতুল দৃষ্টি গুটিয়ে নিলেও অর্জুন দু'এক মিনিট ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ দু'জনের চোখে চোখ পড়তেই অর্জুন একটু চাপা হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে বই পড়ে।

বিমল উপরের বার্থে শুয়ে অর্জুনকে মাঝে মাঝেই ওভাবে পুতুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাগে জ্বলে-পুড়ে গেলেও মুখে কিছু বলতে পারে না।

বোধহয় অর্জুনকে একটু সতর্ক করে দেবার জন্যই ও জিজ্ঞেস করে, তাতাই, ঘুমিয়েছ?

তাতাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ও কোন জবাব দেয় না।

পুতুল, ঘুমিয়েছ?

পুতুল জেগে থাকলেও চুপ করে থাকে। ও কখনও চোখ বন্ধ করে থাকে, কখনও দু'চোখ ভরে স্বপ্নপুরীর রাজপুত্রকে দেখে।

স্বপ্নপুরীর রাজপুত্রও প্রত্যেকবার হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দেবার সময়ই একটু যেন বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে পুতুলকে দেখে।

মাদ্রাজ মেলে কখনও ছুটছে, কখনও আবার থামছে দু'চার মিনিটের জন্য। রাত এগিয়ে চলে। অর্জুন ঘুমোন না। বই পড়েন, হুইস্কী খান। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে পুতুলকে দেখেন। বোধহয় না দেখে পারেন না।

পুতুলের চোখেও আজ ঘুম আসে না। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে শুধু আবোল-তাবোল ভাবে। দু'পাঁচ মিনিট অন্তরই মাথাটা একটু ঘুরিয়ে অর্জুনকে দেখে।

সারা রাত ধরে চৌকিদারী করার ইচ্ছা থাকলেও এক সময় নিজের অজান্তেই বিমল ঘুমিয়ে পড়ে।

মাদ্রাজ মেল থামতেই পুতুল আবছা আলোয় নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে। তিনটে পাঁচিশ!

ওর একবার ইচ্ছে করে অর্জুনকে একটু বকুনি দিতে—কী ব্যাপার বলুন তো! সারা রাত ধরে হুইস্কী খাবেন? চট পট আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এভাবে রাত জাগলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে যে।

না, পুতুল কিছুই বলে না। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

অর্জুন হুইস্কীর গেলাসে শেষ চুমুক দিতে গিয়েই পুতুলের দিকে তাকিয়েই ওকে জেগে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়। না, অর্জুন আর এক মুহূর্ত দেরি না করেই বইখানা পাশে রেখে রিডিং লাইট অফ্ করে শুয়ে পড়েন।

খুর্দা রোডের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতেই বিমল পুতুলকে বলে, তোমার অর্জুন কুমার বোধহয় সারারাতই মদ গিলেছে, তাই না?

পুতুল বিরক্ত হয়েই বলে, আমি কী সারারাত জেগে দেখেছি কে কি করছে?

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ একবার ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখলাম, শ্রীমান তখনও পান করে চলেছেন।

পুতুল কোন কথা না বলে চা খায়।

অত মাল টানার পর শ্রীমান বোধহয় আজ সারাদিনই ঘুমোবে।

ঘুমোবে ঘুমোক ; তোমাকে ডেকে দিতে হবে না।

খুর্দা রোড থেকে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা খানেক পর অর্জুনের ঘুম ভেঙে যায়। একবার ঘড়ি দেখেই বিমল-পুতুলের দিকে তাকিয়েই বলেন, গুড মর্নিং।

মর্নিং।

খুর্দা রোড চলে গেছে?

হ্যাঁ।

অর্জুন আর কোন কথা না বলে টয়লেটারিজের ছোট্ট ব্যাগ আর জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে চলে যেতেই পুতুল একটু হেসে বিমলকে বলে, দেখলে তো, অর্জুন চ্যাটার্জী মদ খায় কিন্তু মদ ওকে খেতে পারে না।

বিমল চুপ করে থাকলেও পুতুল আবার বলে, অর্জুন চ্যাটার্জী শুধু শুধু উন্নতি করেনি। অনেক সংযম, অনেক সাধনা না থাকলে এত নাম-ধাম খ্যাতি-যশ অর্জন করা যায় না।

ট্রেন বেরহামপুর পৌঁছবার মিনিট দশেক আগে অর্জুন বাথরুম থেকে ফিরে আসেন। পরনে সাদা ট্রাউজার আর প্রিন্টেড সিল্কের বুশ সার্ট। শুধু পুতুল না, বিমল আর তাতাইও এই অসামান্য সুন্দর মানুষটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

অর্জুন এক মুহূর্ত নষ্ট না করে কোট-প্যান্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য সবকিছু সুটকেশে ভরে নিয়েই একটা বিরাট প্যাকেট বের করে তাতাই এর হাতে দিয়ে বলেন, টাটাই, এর মধ্যে বোধহয় অনেক ভাল ভাল খাবার আছে। তুমি খাবে। আর একটু একটু বাবা-মা'কে দেবে, কেমন?

তাতাই মাথা নাড়ে।

অর্জুন বিমলকে বলেন, মিঃ চক্রবর্তী, আমার জন্য আপনাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে। প্লীজ মাপ করবেন।

কী বলছেন আপনি?

বিমল প্রায় না থেমেই বলে, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কাটানো গেল, একি কম সৌভাগ্য?

অর্জুন একটু হেসে বলেন, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না ; তবে এইটুকু জানি, আমি আপনার অনেক বিরক্তির কারণ হয়েছি।

বিমল তাড়াতাড়ি ওর দুটো হাত ধরে বলে, ফর গডস্ সেক্, সত্যি, একটুও বিরক্তি হইনি ; বরং খুব আনন্দই পেয়েছি।

এবার অর্জুন একটু ঝুঁকে পুতুলের মুখের সামনে মুখ নিয়ে ওর চোখের পর চোখ রেখে বলেন, আপনাকে দেখতে ঠিক আমার মায়ের মত।

কথাটা শুনে ওরা দু'জনে চমকে ওঠে।

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বলে যান, ছবিতে যেমন মাকে দেখি, আপনাকে দেখতে ঠিক সেইরকম। ঠিক মায়ের মতই টানা টানা বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, সেই মুখের হাসি, বিরাট খোপা...।

অর্জুন কথাটা শেষ না করেই দু'হাত দিয়ে পুতুলের মুখখানা ধরে বলে, আমি আপনাকে মা বলে ডাকবো, আপনি আমাকে মানিক বলে ডাকবেন। মা আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন।

কথাগুলো বলতে বলতেই ওর দুটো চোখ দিয়েই কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

আনন্দ-বেদনায় পুতুলের দু'চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে।

মাদ্রাজ মেল বেরহামপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই অর্জুন পুতুলের দু'পায় হাত দিয়ে প্রণাম করেই একটু হেসে বলেন, মা, আশীর্বাদ করবে না?

আনন্দে, খুশিতে, আত্মতৃপ্তিতে পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়ে পুতুল দু'হাত দিয়ে অর্জুনের মুখখানা ধরে ওর কপালে চুম্বন করে বলে, আমার ছেলে রাজার রাজা হবে।

প্রোডিউসার, ডিরেক্টর ও আরো কয়েকজনকে কম্পার্টমেন্টের দরজায় দেখেই অর্জুন বলেন, আপনারা মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ান। আমি আসছি।

ওরা মালপত্র নিয়ে নীচে নামতেই অর্জুন পার্স থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে পুতুলের হাতে দিয়ে বললেন, মা, এই কার্ডে আমার পার্সোন্যাল টেলিফোন নম্বর আছে। সকালের দিকে ফোন করে বলে দিলেই আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবো। তোমরা আসবে তো?

পুতুল হাসতে হাসতে বলে, ছেলের কাছে যাবো না, তাই কী কখনও হয়?

হঠাৎ দেখা

এভাবে হঠাৎ মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তা সিদ্ধার্থ বা সোহিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

একমাত্র সন্তান বিয়ের পর সংসার করার জন্য বরোদায় চলে যাবার পর ওরা দু'জনেই নীরবে এক বিচিত্র নিঃসঙ্গতার জ্বালা সহ্য করেন। তারপর আস্তে আস্তে আবার অনেকটা স্বাভাবিক হন।

সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে পা দিয়েই সোহিনীকে চিঠি পড়তে দেখে একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, সায়ন্তনীর চিঠি এসেছে?

উনি প্রায় না থেমেই ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেখি, দেখি।

সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন, এটা ওর পুরনো চিঠি।

—ও!

সিদ্ধার্থ একটু হতাশ হয়েই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

সোহিনী মুখ না তুলেই একটু গলা চড়িয়ে বলেন, শ্রীধর, সাহেবকে চা দাও।

কিচেনের ভিতর থেকেই শ্রীধর জবাব দেয়, দিচ্ছি মেমসাহেব।

চা-সিগারেট খেয়ে সিদ্ধার্থ বাথরুমে যান, স্নান করেন। তারপর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আবার ড্রইংরুমে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন, কি হলো সোহিনী? কি এত চিন্তা করছো?

সোহিনী আপনমনেই একটু হেসে বলেন, ভাবছি, কিভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ একটু হেসে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর উল্টো দিকের সোফায় বসে বলেন, সত্যি! কি আশ্চর্যভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল, তা ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সায়ন্তনীকে দেখে আমার কত বন্ধুবান্ধব আর সহকর্মী যে ভাই-ভাইপো বা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছে, তার ঠিকঠিকানা নেই।...

—জানি।

—কিন্তু আমি সবাইকে সাফ বলে দিয়েছি, মেয়ে এম. এ পাশ করুক। তারপর চিন্তা করে দেখব, কবে ওর বিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীধর ট্রলি-ট্রে'তে হুইস্কীর বোতল, আইস বক্স, ঠাণ্ডা জলের বোতল, গেলাস আর এক প্লেট চীজ পাকৌড়া এনে সেন্টার টেবিলে সব সাজিয়ে রেখে চলে যায়। সিদ্ধার্থ গেলাসে হুইস্কী ঢেলে জল মিশিয়ে নেবার পর ঠিক দুটো আইস কিউব ফেলে এক চুমুক দিয়েই হাসতে হাসতে বলেন, প্রফেসর চিত্রা চৌধুরী এসে সব হিসেব-নিকেশ উল্টে-পাল্টে দিলেন।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, সব ব্যাপারটা ভাবলে আমার এখনও যেন মনে হয়, স্বপ্ন দেখছি।...

সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরীতে, শ্রীধর বাজারে গিয়েছিল আর সায়ন্তনী গিয়েছিল বাণীচক্রে দ্বিজেন মুখার্জীর কাছে গান শিখতে। তাইতো বেল বাজতেই সোহিনীই দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক হয়ে তাকায়।

ভদ্রমহিলা এক গাল হাসি হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলেন, আমি চিত্রা চৌধুরী। সায়ন্তনী আমার ছাত্রী।

সোহিনীও এক গাল হাসি হেসে বলেন, আসুন, আসুন। মেয়ের কাছে আপনার প্রশংসা শুনি না, এমন দিন যায় না।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই মিসেস চৌধুরী বলেন, প্রশংসা করার তো কারণ দেখি না। তবে হ্যাঁ, আপনার মেয়েকে আমি একটু বেশি পছন্দ করি।

মিসেস চৌধুরী সোফায় বসতেই সোহিনী জিজ্ঞেস করেন, কি খাবেন বলুন। ঠাণ্ডা, নাকি গরম?

উনি একটু হেসে বলেন, আমার কথা শুনলে হয়তো আপনি আমাকে সন্দেশ-রসগোল্লাও খাওয়াতে পারেন ; আবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন।

—প্লীজ, ও কথা বলবেন না।

সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি দয়া করে এসেছেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

মিসেস চৌধুরী বলেন, ওসব কথা থাক। আমি কিন্তু এসেছি অনেক আশা নিয়ে। যদি দয়া করে আমার অনুরোধ রাখেন...

—আপনাকে আমি দয়া করবো? কি বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সায়ন্তনীকে প্রথম দিন দেখেই মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিয়েছিল। তারপর গত তিন বছরে ওকে যত দেখেছি, আমার তত বেশি ভাল লেগেছে।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, আপনাকে ও যে কি শ্রদ্ধা করে, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমরা দু'জনেই দুজনকে ভালবাসি।

ঠিক এই সময় শ্রীধর বাজার থেকে ফিরতেই সোহিনী বললেন, ইনি সায়ন্তনীর প্রফেসর। শিগগির চা-টা দাও।

টা-চা খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী বললেন, আপনি অনুমতি দিলে একটা কথা বলতাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। এত দ্বিধা করছেন কেন?

মিসেস চৌধুরী আস্তে আস্তে শুরু করেন, আমার বাবা রিপন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন ; আবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেও লেকচারার ছিলেন। ঠিক দশ বছর হলো বাবা মারা গিয়েছেন।

—মা বেঁচে আছেন?

—না, না ; মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছেন।

উনি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন, আমরা তিন ভাইবোন। সব চাইতে বড় হচ্ছেন দাদা, তারপর আমি আর আমার ছোট ভাই।

সোহিনী কোন প্রশ্ন না করে ওর কথা শুনে যান।

—দাদা ব্যাঙ্গালোর থাকেন।

—উনি কি করেন?

—ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব সায়েন্সের সিনিয়ার সাইনটিফিক অফিসার আর বৌদি একটা কলেজে পল, সায়েন্সের লেকচারার।

—ওদের ছেলেমেয়েরা কত বড়?

—ওদের দুটি মেয়ে। বড় মেয়েটি আমেদাবাদে ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট অব ডিজাইনে এই বছরই ভর্তি হয়েছে আর ছোট মেয়ে নাইন'এ পড়ছে।

সোহিনী বলেন, আমার এক বন্ধুর ছেলেও এন-আই-ডি'তে গত বছরই ভর্তি হয়েছে কিন্তু সায়ন্তনীর এক বন্ধু পর পর দু'বছর পরীক্ষা দিয়েও ভর্তি হতে পারলো না।

—ওখানে ভর্তি হওয়া সত্যি খুব কঠিন ; তবে একবার ওখানে ঢুকতে পারলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না।

—হ্যাঁ, জানি।

সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, আপনার স্বামীও কি অধ্যাপনা করেন?

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, না, না, ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফাইনান্স ম্যানেজার।

—ছেলেমেয়েরা কত বড়?

—আমার দুটি ছেলে। বড়টি দশ বছরের আর ছোটটি ন'বছরের।

—আপনার ছোট ভাই কি করেন?

প্রশ্নটা শুনেই মিসেস চৌধুরীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, ওর কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি।

সোহিনী কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই উনি বলেন, আমার ছোট ভাই ম্যাসাচুসেটস্ ইনিষ্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং'এ মাষ্টার্স করে মাস ছয়েক আগেই ইন্ডিয়ান পেট্রো-কেমিক্যালস্'এ জয়েন করেছে।

সোহিনী এক গাল হাসি হেসে বলেন, তার মানে সে তো দারুণ ছেলে!

—হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই সত্যি অসম্ভব ভাল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মাষ্টার্সেও অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে এম-আই-টি ওকে রেখে দেবার জন্য খুব ভাল অফার দিয়েছিল কিন্তু ছোট মামা ওকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

—আপনার ছোট মামাও কি আমেরিকায় থাকেন?

—উনি হার্ভার্ড স্কুল অব ম্যানেজমেন্টে আছেন বহু দিন ধরে। ওর জন্যই তো আমার ছোট ভাই এত বছর ধরে আমেরিকায় পড়াশুনা করতে পারলো।

মিসেস চৌধুরী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলেন, আমার এই ছোট মামা তো আমাকেও ওখানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার ছেলে হলো বলে আমি আর গেলাম না।

—ও!

মিসেস চৌধুরী ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখুন আমার ছোট ভাই এর ছবি।

ছবির উপর চোখ রেখেই সোহিনী বললেন, বাবা! দারুণ হ্যান্ডসাম তো!

—আমার দাদাকেও দেখতে খুব সুন্দর। তিন ভাইবোনের মধ্যে আমিই শুধু ওদের মত সুন্দর না।

সোহিনী চোখ দুটো বড় বড় করে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, গড়িয়াহাটের মোড়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও তো আপনার মত একটা সুন্দরী চোখে পড়বে না। আর আপনি বলছেন...

ওর কথার মাঝখানেই মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, আমার স্বামী তো যখন-তখন ছেলেদের বলেন—হ্যাঁরে, তোদের কালো বুড়ী মা'কে ডেকে দে তো!

—শুনেছি, সুন্দরী চিরযৌবনা স্ত্রীর গর্বে গর্বিত স্বামীরা এইভাবেই কথা বলেন।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দু'জনে হো হো করে হেসে ওঠেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সায়ন্তনী ড্রইং রুমে ঢুকেই ওর পরমপ্রিয় অধ্যাপিকাকে দেখে বিস্ময়-মুগ্ধ খুশিতে এক গাল হেসে বলে, আপনি!

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, কি করবো বলো? তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করলো বলেই চলে এলাম।

সায়ন্তনী সলজ্জ হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের হাসি শুনে ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই রত্নামাসী এসেছে।

সায়ন্তনীর হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে মিসেস চৌধুরী বলেন, তোমাদের মত ছাত্রীদের জন্য কলেজে হাসাহাসি করতে পারি না বলে কি তোমাদের বাড়িতে এসেও হাসতে পারবো না?

মিসেস চৌধুরী দৃষ্টি ঘুরিয়ে সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার ছোট ভাই-এর জন্য এই মেয়েটাকে আমার চাই।

সোহিনী অবাক হয়ে বলেন, কি বলছেন আপনি? অত হাইলি কোয়ালিফায়েড ভাই এর জন্য...

—কিন্তু আমি যে তিন বছর ধরে স্বপ্ন দেখছি, এই মেয়েটাকে আমাদের চাই।...

সিদ্ধার্থ হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন, যাই বলো সোহিনী, রামানুজের মত জামাই পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মেয়ের চিঠিগুলো পড়েই তো বুঝতে পারি,

ছেলেটা কত ভাল।

—যে ছেলেটা এত বছর আমেরিকায় কাটিয়েছে, সে যে ড্রিঙ্ক করে না, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—চিত্রা তো বলছিল, রামানুজ ঠিক ওর ছোট মামার মত চরিত্রবান আদর্শবান হয়েছে।

সিদ্ধার্থ হুইস্কীর গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন, ওরা তিন ভাই বোনই তো ছোট মামাকে দেবতার মত ভক্তি করে।

—ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে ভাল। তা না হলে ওরা এভাবে ভক্তি করে?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

দু' চার মিনিট দু'জনেই চুপচাপ থাকেন।

একটু পরে সোহিনী বলেন, আমাদের মেয়ে তো যাস্ট অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট আর মোটামুটি একটু গান জানে। ওর সঙ্গে যে এত গুণী ছেলের বিয়ে হবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।

—কিন্তু সায়ন্তনীকে দেখতে তো ভারী সুন্দর।

—মেয়ের রূপ থাকলেই যে তার কপালে ভাল বর জুটবে, তার তো কোন মানে নেই।

সিদ্ধার্থ আবার একটু হুইস্কী খেয়েই সোহিনীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, আনন্দদার সঙ্গে শুভশ্রীদির বিয়ের দিন তোমার রূপ দেখেই তো দিদি-জামাইবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাইতো...

সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন, আমার বিয়ের কথা বলো না।

—কেন?

—তখন আমার বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমার বাবা-মা আর দিদি-জামাইবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার বাবা-মা এমনই গলে গেলেন যে আমাকে প্রায় জোর করেই বিয়ে দেওয়া হলো।

সিদ্ধার্থ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, আচ্ছা, তুমি কি সত্যি আগে থেকে কিছু জানতে না?

—না, কিছুই জানতাম না।

—তোমার বাবা-মা আগে থেকে তোমাকে কিছু বলেন নি কেন?

—বাবা-মা খুব ভাল করেই জানতেন, আমি রিসার্চ শেষ না করে কিছুতেই বিয়ে করবো না।

সোহিনী একটু থেমেই আবার বলেন, বাবা-মা আমার মতামত খুব ভাল করে জানতেন বলে আমাকে কিছু না জানিয়েই ছোট মামার চন্দননগরের বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়ের দু'দিন আগে ওখানে পৌঁছে দেখলাম, প্যান্ডেল বাঁধা হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন, আসলে তোমার বাবা-মা আমার মত ছেলেকে হাত ছাড়া করতে চান নি।

—তা ঠিক কিন্তু আমি তো তোমার মত বিলেত থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে চাইনি। আমি চিরকাল ভেবেছি, একজন অধ্যাপককে বিয়ে করবো।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে সুখেও রেখেছি।

—নিশ্চয়ই ভালবাসো, নিশ্চয়ই সুখে রেখেছ কিন্তু প্রত্যেক মেয়ের মত আমিও স্বামী সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখেছি, তা তো সম্ভব হলো না।

হুইস্কীর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সব ছেলেমেয়েরাই অনেক অবাস্তব স্বপ্ন দেখে। বাস্তব জীবনে ওসব স্বপ্নের কোন দামই নেই।

সোহিনী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, যাকগে, ওসব আলোচনা বাদ দাও। এখন তুমিও আমাকে ফেলতে পারবে না, আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না।

এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে যায়। ঘুরে যায় মাসের পর মাস। গ্রীষ্ম-বর্ষার পর আসে শরৎ। এরই মধ্যে সায়ন্তনীর চিঠি এলে আনন্দে-খুশিতে ফেটে পড়েন ওরা দু'জনে।

সিদ্ধার্থ ড্রাইংরুমে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করেন, লেটার ফ্রম মাই বিলাভেড ডটার?

সোহিনী মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, ইয়েস, লেটার ফ্রম মাই বিলাভেড ডটার।

সিদ্ধার্থ সামনের সোফায় বসে জুতা-মোজা খুলতে খুলতে চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমার প্রিয় মেয়ের চিঠি একটু পড়ে শোনাবে নাকি?

—হ্যাঁ, শোনো।

সোহিনী সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন—শ্রদ্ধেয়া মা, তোমরা যখন হঠাৎ আমার বিয়ে দিলে, তখন মনে মনে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে করার মত আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাছাড়া তখন আমার বয়সই বা কত! তাইতো অনেক শঙ্কা-আশঙ্কা নিয়েই বিবাহিত জীবন শুরু করেছিলম। নিজের মনেই নিজেকে

বার বার প্রশ্ন করেছি—পারবো কি স্বামীকে সুখী করতে? স্বামী কি আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখবে? আমার দ্বারা কি সাংসারিক-সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে? আরো কত অসংখ্য প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে।

তারপর দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। সামনের বারোই আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবে। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর ঠিক আগে আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো, আমাদের বিবাহিত জীবন সত্যি সুখের ও আনন্দের হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, আমি আমার স্বামীর জন্য যথেষ্ট গর্বিত। আমাকে নিয়েও তার খুশির সীমা নেই।

শুধু তাই না। দাদা বোম্বে এলেই আমাদের সঙ্গে দু'দিন কাটাবার পরই উনি মেয়েকে দেখতে আমেদাবাদ যান। কখনও কখনও আমরাও দাদার সঙ্গে চলে যাই। ঐ দিনগুলো যে আমাদের কি আনন্দে কাটে, তা লেখার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলবো, দাদা বোধহয় তাঁর প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইয়ের চাইতে আমাকেই বেশি স্নেহ করেন। দাদাকে আমি ঠিক তোমাদের মতই শ্রদ্ধা করি। এই এগারো মাসের মধ্যে দিদি আসতে না পারলেও এরই মধ্যে আমাকে দুটো সুন্দর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দিদি আমাকে চিঠি লেখেন। যদি তোমাদের জামাই ছুটি পায়, তাহলে ডিসেম্বরের শেষে আমরা ব্যাঙ্গালোর যাবো।

দিদি-জামাইবাবুর দু লাইনের চিঠি পেলাম। কি লিখেছেন জানো? লিখেছেন—মাই ডিয়ার ডার্লিং সায়ন্তনী, চিত্রা কলেজে মাষ্টারী করে যা আয় করছে, তার বারো আনাই ব্যয় করছে তোমাকে টেলিফোন করার জন্য। আজকাল আমাকে এক প্যাকেট সিগারেটও প্রেজেন্ট করে না। দিস ইজ ফর ইওর ইনফরমেশন।—ইওর বিলাভেড জামাইবাবু।...

এই ক' লাইন শুনেই সিদ্ধার্থ হো হো করে হেসে ওঠে।

সোহিনী বলেন, এবার চিঠির আসল অংশটা পড়ছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ো।

উনি এবার চিঠির শেষ অংশ পড়তে শুরু করেন—আমাদের দু'জনের শুধু ইচ্ছা নয়, আমাদের দু'জনের দাবী, আগামী বারোই আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন তোমাদের দু'জনকে এখানে আসতেই হবে। তোমাদের কোন ওজর-আপত্তি আমরা শুনব না। আর হ্যাঁ, ছোট মামা আমাদের বিয়ের সময় আসতে পারেন নি বলে আগামী নয় বা দশ তারিখে এখানে আসছেন।...

হঠাৎ সিদ্ধার্থকে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখেই সোহিনী জিজ্ঞেস করেন, কি হলো? মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন? মাথা ধরেছে?

সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি তো যেতে পারবো না।

—কেন? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।

উনি অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বলেন, দুবাইতে আমরা যে মেসিনটা পাঠিয়েছি, তার ট্রায়াল শুরু হবে দশ তারিখ। ঐ ট্রায়ালের জন্য এখান থেকে যে তিনজন এঞ্জিনিয়ারকে যেতে হবে, তার মধ্যে আমি একজন।

—ইস! কি কাণ্ড!

সোহিনী মুহূর্তের জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করেন, এ খবর তুমি কবে জানতে পারলে?

—দুবাই থেকে কালই ট্রায়ালের দিন জানিয়েছে। চীফ্ এঞ্জিনিয়ার আজই আমাদের তিন জনকে অফিসিয়ালি জানালেন।

—তোমাদের কবে রওনা হতে হবে?

—আট তারিখের মধ্যে আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে।

—ফিরবে কবে?

—ট্রায়াল সাকসেস্‌ফুল হলে সাত-দশ দিন পরই ফিরতে পারবো মনে হয়; যদি কোন প্রবলেম দেখা দেয়, তাহলে আরো বেশি থাকতে হবে।

সিদ্ধার্থ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, বারো তারিখে ওদের কাছে থাকতে পারবো না ভেবে সত্যি খুব খারাপ লাগছে। তবে ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের ওখানে যাবো।

—তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই ফিরব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ওখানেই থেকো। তারপর আমরা এক সঙ্গে ফিরব।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে সিদ্ধার্থ বললেন, সোহিনী, তুমি প্লেনেই যেও।

—না, না, প্লেনে যাবো না; ট্রেনেই যাবো।

—একলা একলা এত লং জার্নি করা খুব বোরিং হবে।

—না, না, বোরিং হবে না। সঙ্গে দু'চারটে বই থাকলে সময় বেশ কেটে যাবে।

সোহিনী একটু থেমেই জিজ্ঞেস করেন, এখান থেকে তোমরা কবে রওনা হবে?

—বোধহয় ছ' তারিখ।

—তাহলে ঐ দিনই আমিও রওনা হবো।

—সেদিন রওনা হলে আমি তো তোমাকে ট্রেনেও চড়িয়ে দিতে পারবো না। তুমি তার দু' একদিন আগেই রওনা হবে।

—ঠিক আছে তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই করো।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরেই সিদ্ধার্থ বললেন, সোহিনী, তোমার টিকিট হয়ে গেছে।

—কোন ট্রেনের টিকিট কাটলে?

—তুমি পাঁচই এখান থেকে গীতাঞ্জলিতে যাবে। পরের দিন রাত্রে বোম্বে পৌঁছে আমাদের গেস্ট হাউসে থাকবে। তার পরদিন ভোরে গুজরাত এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় বরোদা পৌঁছে যাবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যোশী তোমাকে রিসিভ করে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে ; উনিই আবার পরদিন ভোরে তোমাকে গুজরাত এক্সপ্রেসে চড়িয়ে দেবেন।

সোহিনী বললেন, ঠিক আছে কিন্তু মেয়ে-জামাইকে তো খবর দিতে হবে।

—সেটা তো কোন সমস্যা না। তুমি যদি চাও আজ রাত্রেই ওদের টেলিফোন করতে পারো ; নয়তো কাল আমি অফিস থেকে...

—না, না, আজই ওদের টেলিফোন করবো। ওরা তো আমাদের খবর জানার জন্য হা করে বসে আছে।

হ্যাঁ, সে রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর সোহিনী মেয়েকে ফোন করেন। সায়ন্তনীই কোন ধরে।

—কে? মা? আমার চিঠি পেয়েছে?

—হ্যাঁ, কালই পেয়েছি।

—তোমরা আসছো তো?

—আমি আসছি কিন্তু তোর বাবা আসতে পারছে না।...

—কেন? বাবা আসবে না কেন?

—তোর বাবাকে ঠিক ঐ সময় দুবাই যেতে হবে।...

—দু'চারদিন আগে পরে যেতে পারছে না?

—তোর বাবাকে আট তারিখে দুবাই পৌঁছতেই হবে।

সোহিনী প্রায় না থেকেই বলেন, তবে দুবাই থেকে ফেরার সময় তোর বাবা তোদের ওখানে যাবে।

—বাবা সত্যিই আসবে তো? নাকি আমাকে ভোলাচ্ছ?

সোহিনী একটু হেসে বলেন, নারে, সত্যি তোর বাবা আসবে। আমি তোর বাবার সঙ্গেই কলকাতা ফিরব।

সায়ন্তনী বেশ অভিমানের সঙ্গেই বলে, বাবা না এলে আমি কিন্তু তোমাকেও যেতে দেব না।

মেয়ের কথা শুনে সোহিনী না হেসে পারেন না। তারপর হাসি থামলে জিজ্ঞেস করেন, রামানুজ কি শুয়ে পড়েছে?

—না, না ; বাথরুমে স্নান করছে।

—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—না, না, ও তো এই মাত্র ক্লাব থেকে ফিরল।

—এতো রাত্রে ক্লাব থেকে...

মা'কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সায়ন্তনী বলে, টেনিসের কম্পিটি'শান চলছে তো! কোনদিনই দশটা-সাড়ে দশটার আগে খেলা শেষ হয় না।

সোহিনী এবার জিজ্ঞেস করেন, তোদের আর কি খবর?

সায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে, জানো মা, একটু আগেই ছোট মামা কায়রো থেকে ফোন করেছিলেন।

—কায়রো থেকে? ওখানে কি উনি বেড়াতে গিয়েছেন?

—না, না, বেড়াতে যান নি। উনি একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য কায়রো গিয়েছেন।

সায়ন্তনীয় মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, জানো মা, ছোট মামা মাঝে মাঝেই আমাকে ফোন করেন। উনি এত সুন্দর কথা বলেন যে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মা। ওনার কথা শুনেই আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

—উনি তো ন'-দশ তারিখে তোদের ওখানে আসছেন?

—ছোট মামা আজই আমাকে বললেন, ওনার পেপার নিয়ে আলোচনা শেষ হলেই ওখান থেকে রওনা হবেন।

—তার মানে দু'চারদিন আগে বা পরে উনি আসছেন।

—না, না, পরে না ; বরং দু'চারদিন আগেই হতে পারে।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, ভদ্রলোকের সম্পর্কে সবাই এত প্রশংসা করে যে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমিও হা করে বসে আছি।

—আমি জোর করে বলতে পারি, ছোট মামার সঙ্গে আলাপ করে তোমার খুব ভাল লাগবে।

পরের দিন দুপুর বেলায় হঠাৎ চিত্রা ফোন করেন।

—মাসীমা, আপনি বরোদা যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি ঠিক কলেজে বেরুচ্ছি, সেই সময় আপনার জামাই ফোন করে খবর দিল।

চিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি আজ কোথাও বেরুবেন নাকি?

—না, না, কোথাও বেরুব না। তুমি আসবে?

—তিনটের সময় আমার ক্লাশ শেষ হবার পরই আসছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো।

চিত্রা এলেন প্রায় চারটে নাগাদ। চা-টা খেতে খেতেই কথা হয়।

—মাসীমা, আমরা তো যেতে পারছি না। তাই ওদের প্রেজেনটেশনটা আপনার সঙ্গেই পাঠাবো।

—হ্যাঁ, তা দিও কিন্তু তোমরা যেতে পারছো না কেন?

—এখন আমাদের দু'জনের কেউই ছুটি পাবো না।

—সপ্তাহ খানেকের জন্যও ছুটি পাবে না?

—না, মাসীমা, অসম্ভব। অনার্সের মেয়েদের এখনও কিছু কোর্স বাকি আছে। যেভাবেই হোক মাস দেড়েকের মধ্যে ওদের কোর্স কমপ্লিট করতেই হবে।

তারপর এ কথা—সে কথার পর চিত্রা বলেন, তবে ছোট মামার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পাবেন।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, তোমাদের সবার কাছে ওর এত প্রশংসা শুনি যে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমিও হা করে বসে আছি।

—বিশ্বাস করুন মামীমা, নিজের ছোট মামা বলে বলছি না। আজকালকার দিনে ওর মত মানুষ সত্যি দুর্লভ।

চিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, উনি এত বড় পণ্ডিত, বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করেন, এত বছর ধরে আমেরিকায় আছেন অথচ ওর মত সহজ সরল প্রাণবন্ত সাদাসিধে বাঙ্গালী এই কলকাতা শহরেও বিশেষ দেখা যায় না।

উনি না থেমেই বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, তবে ছোট মামার জন্য আমরা সবাই খুব চিন্তিত।

—কেন?

—বছর চারেক আগে ছোট মামার বাই পাস সার্জারী হয়েছে। তারপর একলা একলা থাকেন। তাই...

সোহিনী অবাক হয়ে বলেন, আমার মেয়ে-জামাই তো এ খবর কোনদিন জানায়নি।

—ছোট মামাই চান না, ওর অসুখের খবর জানিয়ে কাউকে বিব্রত করা হোক। তাই বোধহয় আমার ভাই আপনাদের কিছু বলে নি।

—যার বাই পাস সার্জারী হয়েছে, তার তো কখনই একলা থাকা উচিত না।

—কিন্তু কি করা যাবে বলুন? উনি তো কিছুতেই বিয়ে করলেন না।

—বিয়ে করলেন না কেন?

সোহিনী একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার বলেন, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেলে মা-বাবার কাছে না থাকতে পারে কিন্তু বিয়ে করলে ওর স্ত্রী তো ওর দেখাশুনা করতে পারতেন।

—এসব কথা আমরাও জানি, উনিও জানেন কিন্তু উনি বিয়ে না করলে আমরা কি করতে পারি?

—কিন্তু বিয়ে করলেন না কেন?

চিত্রা এবার একটু হেসে বলেন, ঠিক জানি না ; তবে ছোট মামার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে শুনেছি, উনি ওরই এক সহপাঠিনীকে ভালবাসতেন কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা অন্য একজনকে বিয়ে করেন বলেই দুঃখে ও অভিমানে ছোট মামা সারাজীবনে বিয়েই করলেন না।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, এ ধরণের ঘটনা তো আকছার ঘটে কিন্তু তাই বলে কি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটাতে হবে?

কেনাকাটা গোছানো-গাছানো আর বাড়ি-ঘরদোরের ব্যাপারে শ্রীধরকে সব বুঝিয়ে দিতে দিতেই মাঝখানের কটা দিন যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। তারপর সিদ্ধার্থ ওকে চড়িয়ে দেন গীতাঞ্জলিতে। ট্রেন ছাড়ার আগে সোহিনী বলেন, যদি পারো দুবাইতে পৌঁছে বরোদায় একটা ফোন করো।

—হ্যাঁ, করবো।

—কবে তুমি বরোদায় পৌঁছবে, তাও জানিয়ে দিও।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানাবো।

পরের দিন ঘণ্টা খানেক লেটে গীতাঞ্জলি ভি. টি. পৌঁছয়। মিঃ যোশী হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে সোহিনীকে গেষ্ট হাউসে পৌঁছে দিয়েই বলেন, ভাবীজি, প্লীজ গেট রেডি বিফোর ফাইভ। উই মাষ্ট লিভ ফর ষ্টেশন অ্যাট ফাইভ।

হ্যাঁ, যথা নির্দিষ্ট পৌনে ছ'টার গুজরাত এক্সপ্রেসে সোহিনী বরোদা রওনা হন। অনেক দিন পর মেয়ে-জামাইকে কাছে পাবার আনন্দে উত্তেজনায় কখন যে সুরাট-ভারুচ পার হয়ে যায়, তা যেন উনি খেয়ালই করেন না।

বরোদা!

সোহিনী এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজেই সুটকেশ হাতে করে প্ল্যাটফর্মে পা দিতে না দিতেই সায়ন্তনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। প্রণাম করে। রামানুজও ছুটে এসে প্রণাম করে। সোহিনী দু'হাত দিয়ে দু'জনকে এক সঙ্গে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

আদর করেন।

ষ্টেশন থেকে গাড়িতে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, জানো মা, ছোট মামা এসে গিয়েছেন।

—উনি কবে এলেন?

—পরশু।

সায়ন্তনী মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, মা, তুমি ভাবতে পারবে না, ছোট মামা কি দারুণ ভাল মানুষ। আমাকে উনি কি বলে ডাকেন জানো?

—কি বলে?

—মা আদরিনী!

—বাঃ! খুব সুন্দর নাম দিয়েছেন তো তোর।

সায়ন্তনী হাসতে হাসতে বলে, ছোট মামা, একটা বদ্ধ পাগল। উনি আমার জন্য একটা সুটকেশ কিনে সেটা ভর্তি করে শুধু আমারই জন্য কত কি এনেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—রামানুজের জন্য কিছু আনেন নি?

—ওর জন্য খুব সুন্দর একটা স্যুট আর দুটো পুলওভার এনেছেন।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পরই সায়ন্তনী আবার হাসতে হাসতে বলে, জানো মা, ছোট মামা কাল রান্না করে খাওয়ালেন। উনি কি সুন্দর রান্না করেন, তাও তুমি ভাবতে পারবে না।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, বেশি দিন বিদেশে থাকলে রান্না করা শিখতেই হয়।

কথায় কথায় রাস্তা ফুরিয়ে আসে। আই-পি-সি-এল কমপ্লেক্সে গাড়ি ঢোকে। ষ্টাফ কোয়ার্টারগুলো বাঁ দিকে রেখে গাড়ি ডান দিকে ঢুকতেই রামানুজ বলে, মা, এই হচ্ছে আমাদের কলোনী।

সোহিনী একবার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েই বলেন, বাঃ! খুব সুন্দর কলোনী তো!

সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, মা, আমাদের কলোনীটা রিয়েলী খুব সুন্দর।

গাড়িটা হঠাৎ থামতেই সায়ন্তনী ওর মা'র হাত ধরে আলতো করে একটু টান দিয়েই বলে, এসো, এসো ; এই আমাদের কোয়ার্টার।

ও রামানুজকে বলে, তুমি মা'র সুটকেশটা নিয়ে এসো।

লনে পা দিয়েই সায়ন্তনী একটু গলা চড়িয়ে বলে, ছোট মামা, শিগ্‌গির দরজা খুলুন। মা এসে গিয়েছেন।

ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—আসছি মা আদরিনী।

রামানুজ সুটকেশ নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ওর ছোট মামা দরজা খুলেই সোহিনীকে দেখে অবাক হয়ে যান। ওকে দেখে সোহিনীও বিস্মিত। কয়েকটা সোনাঝরা মুহূর্তের জন্য দু'জনেই দু'জনকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন। তারপরই রামানুজের ছোট মামা হাসতে হাসতে বলেন, আরে সোহিনী, তুমি!

সোহিনীও হাসতে হাসতে বলেন, শান্তনু, তুমি রামানুজের ছোট মামা!

বিস্মিত রামানুজ আর সায়ন্তনীর দিকে তাকিয়ে উনি চাপা হাসি হেসে বলেন, আমরা দু'জনে এক সঙ্গে বি. এ আর এম. এ পড়েছি।

রামানুজ আর সায়ন্তনী আনন্দে খুশিতে হো হো করে হেসে ওঠে। দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে, মাই গড! হোয়াট এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

একটু পরে চারজনে মিলে কফি খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনু সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমারই ভুল হয়েছে। আমারই বোঝা উচিত ছিল, আমার মা আদরিনী শুধু তোমার পেটেই জন্মাতে পারে।

রামানুজ কফির কাপে চুমুক দিয়েই চাপা হাসি হেসে বলে, ছোট মামা, ইউ রিয়েলী থিংক সো?

—অব কোর্স।

শান্তনু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোর শাশুড়ি কি অসাধারণ ভাল মেয়ে, তা আমি জানি বলেই...

ওর কথার মাঝখানেই সোহিনী বলেন, হঠাৎ এই বুড়ীকে নিয়ে পড়লে কেন? আমি যে কত ভাল বা মন্দ, তা কি আমার মেয়ে জামাই জানে না?

শান্তনু ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে সায়ন্তনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মা আদরিনী, একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেব?

—হ্যাঁ, ছোট মামা, বলুন বলুন।

—এই পৃথিবীতে শুধু সোহিনীই জানে, শ্রেয়া আমাকে বিয়ে করলো না বলেই আমি সারাজীবন একলা একলা কাটিয়ে দিলাম।

সোহিনী বলতে পারলেন না, কালিম্পং, এর সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে শান্তনু ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এই পৃথিবীতে তোমার চাইতে কেউ শ্রেয় নেই বলেই আজ থেকে তোমাকে শ্রেয়া বলে ডাকবো।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শান্তনু, তুমি জানো না, বিয়ের পর পরই শ্রেয়া মারা গেছে?

শান্তনু এক গাল হেসে বললেন, না, না, সোহিনী, আমার শ্রেয়া মরতে পারে না। 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'।

দেনা পাওনা

কি করে যে এই অসম্ভব সম্ভব হলো, তা ভেবে পাই না।

হাজার হোক আমি সামান্য কেরানীর ছেলে আর দুলাল হচ্ছে আই-সি-এস ডি. এম—ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদুরে ছোট ছেলে। আমাদের মধ্যে কি করে যে বন্ধুত্ব হলো, তা আজও ভেবে পাই না।

তাও কী সাধারণ বন্ধুত্ব?

মোটেই না।

দুলাল আমাদের ক্লাসে ভর্তি হবার দু'এক মাস পরই টের পেলাম, ও আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। ছুটির দিনেও আমরা কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারতাম না। আমাকে যেতেই হতো ডি. এম সাহেবের বাংলোয়। থাকতে হতো সারাদিন। সকাল থেকে সন্ধে। পড়াশুনা, খেলাধূলা, খাওয়া-দাওয়া সবই হতো এক সঙ্গে। কোন কোনদিন দুলাল আমাকে ওর বাবার মোটর গাড়িতে চড়িয়েও বাসায় পৌঁছে দিত। সারা পাড়ার লোক হা করে চেয়ে থাকতো।

দুলালের মা কদাচিৎ কখনও জজ সাহেবের বাংলোয় যাওয়া ছাড়া বাইরে বিশেষ বেরুতেন না। দোতলার বারান্দায় বসে হয় খবরের কাগজ পড়তেন, না হয় সোয়েটার বুনতেন। দোতলা থেকে একতলাতেও উনি বিশেষ নামতেন না। দুলালের মাকে দেখলেই আমার কেমন ভয় ভয় করতো। সব সময় মনে হতো, উনি বোধহয় বকুনি দেবেন। তাই তো আমি ওর ধারে-কাছেও যেতাম না। আদর করা তো দূরের কথা, উনি কখনো আমাকে কাছেও ডাকতেন না।

প্রথম দিন দুলালের বাবাকে দেখেও ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা। পাক্কা সাহেবদের মত গায়ের রঙ। সাহেবদের মতই সব সময় কোট-প্যান্ট-টাই পরে থাকেন। কাঁচা-পাকা গোঁফ। চোখে চশমা। আমি তো দূরের কথা, ওকে দেখে অনেক ডেপুটি আর বড় বড় পুলিশ অফিসারদেরও প্যান্টুলুন ঢিলে হয়ে যেতো। তাইতো ওকে দূর থেকে দেখলেই আমি দৌড়ে পালাতাম।

কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন ওর মুখোমুখি পড়ে গেলাম, কোনমতেই পালাতে পারলাম না। সেদিন উনি এক গাল হেসে আমাকে বললেন, তুমিই তো বাচ্চু, তাই না?

কোন মতে বললাম, হ্যাঁ।

দুলাল বলছিল, তুমি লেখাপড়ায় খুব ভালো।

আমাদের ক্লাশের বেষ্ট বয় বিকাশ। ও বরাবর ফার্ষ্ট হয় ; আর আমি কোনবার সেকেন্ড, কোনবার থার্ড।

উনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু হেসে বললেন, ভাল ছেলে না হলে কী সেকেন্ড-থার্ড হওয়া যায়?

উনি আর কোন কথা না বলে মোটরগাড়ি চড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুলাল দোতলা থেকে নেমে আসে।

আমি আনন্দে খুশিতে একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, তোর বাবা তো খুব ভাল।

দুলাল এক গাল হাসি হেসে বলল, আমার বাবার মত মানুষ হয় না।

বিলেত ফেরত সাহেব হয়েও আমার সঙ্গে কি সুন্দর বাংলায় কথা বললেন।

আমার কথা শুনে ও বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল, বাংলায় কথা বলা তো দূরের কথা, বাবা রবি ঠাকুরের সব কবিতা গড় গড় করে মুখস্ত পর্যন্ত বলতে পারেন।

সত্যি?

মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি।

ঠিক পরের বছরই দেশ দু'টুকরো হলো। আমরা চলে এলাম কলকাতা আর দুলালরা যে কোথায় গেল, তা জানতেও পারলাম না।

প্রায় বছর দশেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। আমি ম্যাট্রিক ও আই. এস-সি পাশ করে বি. এ পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজের রিপোর্টারও হয়েছি। তাইতো দু'টো-আড়াইটে পর্যন্ত কলেজের ক্লাশ করেই খবরের সন্ধানে চলে যাই রাইটার্স বিল্ডিং বা লালবাজার। অথবা কোন জনসভায় বা সাংবাদিক সম্মেলনে।

একদিন রাইটার্স বিল্ডিং এর করিডরে হঠাৎ দুলালের সঙ্গে দেখা।

আনন্দে খুশিতে ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, তুই এখানে? রাইটার্সে চাকরি করছিস?

ও আমার কথার জবাব না দিয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ইরিগেশন সেক্রেটারী এ. কে. চৌধুরী আই-সি-এস' এর ঘরের মধ্যে হাজির করে বলল, বাবা, এই যে বাচ্চু।

উনি অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কোথায় দেখা হলো?

এইত এখানেই।

এবার মিঃ চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী এই রাইটার্সেই কাজ করো?

আমি রিপোর্টার হয়েছি বলেই রাইটার্সে আসতে হয়।

তুমি রিপোর্টার হয়েছে? লেখাপড়া করছো না?

হ্যাঁ. বি. এ পড়ছি।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত ক্লাশ করার পরই কাগজের কাজে বেরোই।

বাঃ! খুব ভাল।

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, তোমার বন্ধু তো আই. এ পাশ করেই লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করতে শুরু করেছে।

দুলালদের লেক টাউনের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করার পর দেখলাম, ওর বড়দা-মেজদা এক কালে হস্টেলে থেকে দার্জিলিং-এর স্কুলে পড়ে সাহেবী কায়দা-কানুন শিখলেও মামুলি গ্রাজুয়েটও হতে পারেন নি এবং দু'জনেই সরকারী অফিসের কেরানীগিরি করছেন। তবে ওদের হাব-ভাব চাল-চলন দেখে মনে হতো, ওরাও যেন বাবার মত আই-সি-এস! দুলালের মাকেও দেখে বেশ অহঙ্কারী মনে হতো। তাছাড়া বিষয়-সম্মত্তি টাকাকড়ির ব্যাপারে ওর সীমাহীন দুর্বলতা দেখেও ভাল লাগতো না। দুলাল ঠিক ওদের বিপরীত। যে মানুষটিকে নিয়ে স্ত্রী ও দুই পুত্রের এত অহঙ্কার, সেই মানুষটি কিন্তু নিছকই স্বল্পভাষী বিনয়ী ও সর্বোপরি অত্যন্ত সাদামাটা ছিলেন। দু'চারদিন অন্তর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অক্সফোর্ড থেকে বই কেনা ছাড়া ওর কোন সখও ছিল না।

প্রায় বছর খানেক পরের কথা।

রাইটার্সে মিঃ চৌধুরীর ঘরে যেতেই উনি বললেন, বাচ্চু, একটা জরুরী কারণে

তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই উনি বললেন, বড় ছেলের বিয়ের খবর শুনেছো তো?

হ্যাঁ, দুলাল বলছিল।

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

আমি একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো।

কাজটা খুবই গোপনীয়।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, আমার স্ত্রী বা বড় দুই ছেলে তো দূরের কথা, এমন কি তুমি তোমার বন্ধুকেও জানাতে পারবে না।

আপনি যখন বারণ করছেন, তখন নিশ্চয়ই কাউকে জানাবো না।

এবার মিঃ চৌধুরী বললেন, দু'চারদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে নিয়ে একবার বৌমার বাড়ি যাবো। তারপর তোমাকে কিছু জিনিষপত্র ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। পারবে তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবো।

সপ্তাহ খানেক পর থেকেই বিয়ের জিনিষপত্র আমি বৌদিদের বেহালার বাড়িতে পৌঁছতে শুরু করলাম।

বাচ্চু, আজ এই ষোল গাছা চুড়ি পৌঁছে দাও।

চুড়িগুলো পৌঁছে দেবার দু'তিন দিন পর মিঃ চৌধুরী আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, বেয়াই মশাইকে বলবে, এর মধ্যে গলার হার আর দুটো ঘড়ি আছে।

পরের শনিবার প্রবর্তকের দোকান থেকে থেকে ঠেলা গাড়ি করে পৌঁছে দিলাম খাট-ড্রেসিং টেবিল-আলমারী-সোফা সেট।

এর পর দুটো নতুন সুটকেশ ভর্তি কাপড়-চোপড়। আরো কি কি যেন।

সব শেষে একদিন বড়বাজার থেকে ঠেলা করে পৌঁছে দিলাম বস্তা ভর্তি ময়দা, টিন ভর্তি তেল-ঘী ও শত খানেক ছোট-বড় প্যাকেট। বেহালার একটা মিষ্টির দোকানে আমিই টাকা জমা দিয়েছিলাম, বিয়ের দিন সন্দেশ-রসগোল্লা-দই বৌদিদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য।

যাইহোক বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় দুলালদের বাড়ি পৌঁছে দেখি বরযাত্রী রওনা হবার বিশেষ দেরি নেই। মিঃ চৌধুরীকে তখনও পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বললাম, মেসোমশাই, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। এখুনি তো রওনা হতে হবে।

উনি যেন কথাটা শুনেও শুনলেন না।

দশ-পনের মিনিট পর হঠাৎ দোতলায় বারান্দার ধারে ওর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই উনি চাপা গলায় আমাকে বললেন, বাচ্চু, আমি বরযাত্রী যাবো না।

আপনি যাবেন না তাই কী হয়?

উনি একটু হেসে বললেন, তুমি তো বুঝতেই পারছো, আমি গেলে বৌমা বা তাঁর বাবা-মা ঠিক সহজ স্বাভাবিকভাবে আনন্দ করতে পারবেন না। তাই...

না, উনি আর কথাটা শেষ না করেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

আমি বিস্ময়-মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বড়দার বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই উনি একদিন হঠাৎ এ সংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন। ওর মৃত্যুর খবর আমাদের কাগজে আমিই লিখেছিলাম কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ বলে ওর অবিস্মরনীয় মহত্ত্বের কাহিনীটি লিখতে পারি নি।

দুলালের সঙ্গে মাঝে মাঝেই এখানে-ওখানে দেখা হতো। তাছাড়া ও কখনও কখনও আমাদের অফিসে এসে রিপোর্টারদের ঘরে বসে আমার ও আমার অন্য সহকর্মীদের সঙ্গেও আড্ডা দিত। তাই তো ওদের বাড়িতে বিশেষ যেতাম না। তাছাড়া মেসোমশাই মারা যাবার পর ওদের বাড়িতে গিয়েও বিশেষ ভাল লাগতো না।

বছর চারেক পরের কথা।

একে রবিবার, তার উপর আমার অব্ ডে। একটু বেলা থাকতেই দুলালদের বাড়ি চলে গেলাম।

ড্রইং রুমে পা দিয়েই দেখি, মাসীমা আর বৌদি দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

আমাকে দেখেই বৌদি একটু হেসে ভদ্রলোকদের বললেন, এ হচ্ছে আমার ছোট দেওর-এর বন্ধু। দৈনিক সংবাদের রিপোর্টার।

আমি হাত জোড় করে ওদের নমস্কার করতেই মাসীমা আমাকে বললেন, বাচ্চু, বসো।

আমি এক পাশের একটা বেতের চেয়ারে বসতে না বসতেই বৌদি ঐ ভদ্রলোকদের বললেন, হাজার হোক আপনাদের মেয়ে আই-সি-এস' এর পুত্রবধূ হতে চলেছে। তাইতো তাকে যদি শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তো...

বৌদিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই এক ভদ্রলোক বললেন, না, না, তাই কী পাঠাতে পারি? আমি আমার মেয়েকে যথা সাধ্য নিশ্চয়ই দেব কিন্তু তিরিশ

ভরি গহনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এতক্ষণে বুঝলাম, মেজদার বিয়ের ব্যাপারে দেনা-পাওনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

মাসীমা বললেন, আমার এই বড় বৌমার বাপের বাড়িও বড়লোক না কিন্তু তবু বৌমাকে ওরা প্রায় তিরিশ ভরিই সোনা দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক অত্যন্ত সবিনয়ে নিবেদন করলেন, দিদি, সবার ক্ষমতা কি সমান? সত্যি বলছি, আমি বড় জোর পনের ভরি সোনা দিতে পারি। তার বেশি...

বৌদি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি পনের ভরির বেশি গহণা দিতে পারবেন না, বৌভাতের অর্ধেক খরচ দেবেন না, বরযাত্রী নেবার জন্য গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না অথচ আই-সি-এস'এর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে চান? আপনার কী কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম কিন্তু বলতে পারলাম না, বৌদি, আমার সামনে এভাবে দরাদরি করতে আপনার লজ্জা করল না? কীভাবে ও কার সাহায্যে আপনার বিয়ে হয়েছিল, সে কথা কী আপনি ভুলে গেছেন?

বৌবাজারের বৌদি

তপুকে দেখেই চমকে উঠলাম। আমি কিছু বলার আগেই ও কোনমতে চোখের জল সামলে বলল, মামাবাবু, মা চলে গেলেন।

—কবে? কী হয়েছিল? আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না?

তপু একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, আমি জানতাম আমার মা পুণ্যবতী কিন্তু জানতাম না, মা এত পুণ্যবতী।

আমি মুখে কিছু বলতে পারি না। শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

—মাত্র দিন সাতেকের জন্য মাকে নিয়ে গত শনিবারই কাশী গিয়েছিলাম। রবিবার সকালে মা দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলেন। বাবা বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গা জল ঢেলে মা প্রণাম করতে করতেই হঠাৎ ঢলে পড়লেন।

তপু থামতেই আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, তারপর?

ও চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বলল, মামাবাবু, মা বিশ্বনাথের পায়ে প্রণাম করতে করতেই চলে গেলেন।

—বল কী?

—হ্যাঁ, মামাবাবু। মন্দিরের পূজারীরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার এনে হাজির করলেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এক গাল হাসি হেসে বললেন, বাবা ওকে নিজের কাছে ঠাঁই দিয়েছেন ; কোন ডাক্তার-বদ্যিরই কিছু করার নেই।

আমার মুখে কোন কথা আসে না। আপনমনে কত কি ভাবি।

তপু কার্ডখানা আমার হাতে দিয়ে বলল, মামাবাবু, আপনি না এলে কিন্তু মা-র আত্মা শান্তি পাবে না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ, তপু, নিশ্চয়ই আসব। না গেলে তো আমিও শান্তি পাবো না। তোমার মা যে আমাকে কি ভালবাসতেন, আমার কত উপকার করেছেন, তা কী আমি ভুলতে পারি?

তপু চলে যাবার পর আপনমনে কত কি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, জীবনে চলার পথে কতজনেরই সঙ্গে তো আলাপ-পরিচয় হয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয় কিন্তু দীর্ঘদিন পরে তাদের সবার কথা কী মনে পড়ে? পুরনো স্মৃতির পর নিত্য নতুন সুখ-দুঃখের পলি জমতে জমতে কত কথা, কত কাহিনীই তো চাপা পড়ে যায়। হারিয়ে যায়। নতুনদি'র কথাও আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

এইতো মাত্র বছর দশেক আগেকার কথা। দক্ষিণ-ভারতের নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এসেছি কন্যাকুমারী। বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডাইনে আরব সাগর, সামনে ভারত মহাসাগর। প্রথম দিন অপরাহ্নে পৌঁছেই বিকেল-সন্ধেয় গেলাম কন্যাকুমারীর মন্দির ; গান্ধী মন্দিরের দোতলা থেকে সূর্যাস্ত দেখে সমুদ্রের পাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতেই দূর থেকে বিবেকানন্দ শিলা ও মন্দির দেখেই কেরালা হাউসে ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়লাম বিবেকানন্দ শিলা যাবার জন্য। নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা ভাষী, নানা ধর্মের এক পাঁচ মিশালী মানুষের লাইনে দাঁড়িয়ে লঞ্চের টিকিট কেটে ওয়েটিং হল-এ অপেক্ষা করছি। পাঁচ-দশ মিনিট পরই হঠাৎ এক বয়স্কা মহিলা আমার সামনে এসে একটু হেসে বললেন, তুমি বাচ্চু না?

আমি অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

আমার কথার জবাবে নিজের পরিচয় না দিয়ে উনি এক গাল হেসে বললেন, তুমি ঠিক আগের মতই আছো ; শুধু মাথার চুলই সাদা হয়েছে।

আমি অবাক হই। একটু হাসি। তারপর বলি, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

—না চেনারই কথা। অনেক বছর তো দেখাশুনা নেই ; তবে একেবারে ভুলে যাবার মত তো আমাদের সম্পর্ক ছিল না।

হাসতে হাসতে কথাগুলো বলেই উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, আমি নতুনদি।

—নতুনদি?

আমি অবাক হয়ে কথাটা বলতেই উনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন, সেই বৌবাজারের নতুনদি। তুমি ছাড়া আর সবাই বলতো, বউবাজারের বৌদি। এবার মনে পড়েছে?

মুহূর্তের মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া সব পুরনো স্মৃতিতে আমার মন তোলপাড় করে তোলে।

এক গাল হেসে বলি, তুমি সেই নতুনদি?

উনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেই মুখ ঘুরিয়ে একটু গলা চড়িয়ে বলেন, এই তপু, এদিকে আয়।

যুবকটি কাছে আসতেই নতুনদি বলেন, বাচ্চুকে প্রণাম কর। এ তোর মামা হয়।

না, আর কোন কথা হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই লঞ্চে ওঠার ডাক পড়ে।

আমার আশেপাশে তিন দিকে সমুদ্র কিন্তু আমি সে দৃশ্য দেখেও দেখতে পাই না। মন চলে যায় আমার সাংবাদিক জীবনের প্রথম দিকের এক বিস্ময়কর অধ্যায়ে।...

কলকাতার যে নগণ্য দৈনিকে রিপোর্টার হয়েছি, সেখান থেকে মাত্র পনের টাকা পাই। তা থেকে একটা পয়সাও নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারি না। সবই চলে যায় ট্রাম-বাস ভাড়ায়। সকালবেলায় ক্লাস ফাইভের ছাত্র পড়িয়ে যে পনের টাকা পাই, তা দিয়ে কলেজের মাইনে আর খাতাপত্তরের খরচ চালাই। বাবার পুরনো দেনা শোধ করার জন্য ক্লাশ নাইনের ছাত্র পড়াই। হাতে কিছুই পাই না। এক কথায় খুবই অভাবে আছি।

হঠাৎ এক সহৃদয় প্রবীণ সাংবাদিক এক সাপ্তাহিকে পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। মাসিক প্রাপ্তি তিরিশ টাকা। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

হাতে স্বর্গ পাবার কারণ ছিল। মাত্র কয়েক বছর আগেই দেশ দু'টুকরো হয়েছে। ঠিক তার আগেই হয়েছে বীভৎস দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে এপারে এসেছেন। শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্য চারদিকে হাহাকার। কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তখন কি না করছে।

যাইহোক সাপ্তাহিকের অফিসে যেতে হয় প্রতিদিনই। অন্যান্য দিন নিজের সুবিধা মত সময়ে গিয়ে দু'আড়াই ঘণ্টা কাজ করে চলে এলেও শুক্র-শনিবার রাত সাড়ে দশটা-এগারটা পর্যন্ত থাকতেই হয়। কাগজ ছাপা হয় শনিবার রাত্তিরেই।

সাপ্তাহিকের অফিসটি সেন্ট্রাল এভিনিউ-বউবাজারের মোড়ে একটা সরু গলির মধ্যে। আমাদের অফিসের পাশেই ছাপাখানা ; ঐ ছাপাখানাতেই আমাদের কাগজ

ছাপা হয়। আমাদের দিকের বাকি সব ঘরগুলিই কাঠের আড়ত। বিপরীত দিকের সব বাড়ির একতলাতেই নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস হলেও প্রত্যেকটি বাড়ির দোতলায় ম্যাসাজ বাথ।

ম্যাসাজ বাথ?

হ্যাঁ।

বিকেলের দিকে আঠারো-কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে থেকে শুরু করে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিতারাও আসেন ম্যাসাজ বাথ'এ যৌনক্ষুধাতুর পুরুষদের সেবা করতে। সাপ্তাহিকের কাজ সেরে রাত দশটা-সাড়ে দশটায় ঐসব মেয়েদের সঙ্গে আমিও বাস স্টপে দাঁড়াই। দু'চার মাসের মধ্যেই মুখ চেনার পর্ব শেষ হয়। তারপর দু'চারজনের জন্য সামান্য দু'একটি কথাবার্তা। ওদের মধ্যে কয়েকজন আমারই বাসে ওঠেন। জায়গা থাকলে কেউ কেউ পাশে বসতে দেন। কদাচিৎ কখনও দু'একজন আমারও টিকিট কাটেন। আপত্তি করলে বলে, একদিন না হয় আপনিও আমার ভাড়া দিয়ে দেবেন।

ওরা কেউ আগে নামেন, কেউ পরে নামেন। পরদিন রাত্রে আবার দেখা হয়।

দু'চার-ছ'মাস এইভাবে নিত্য দেখা হতে হতে আলাপ পরিচয় হয়। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করো, বাচ্চুবাবু, আজ কি একটা মিছিলের উপর পুলিশ সত্যি গুলী চালিয়েছে?

—হ্যাঁ।

পারুল আর ছায়াদি একই সঙ্গে প্রশ্ন করেন, অনেক লোক মরেছে?

—দু'জন মারা গিয়েছে আর পাঁচজন জখম হয়েছে।

মিতা সামনের সীটে বসেও প্রশ্ন করেন, আপনি কি রিপোর্ট নেবার জন্য ওখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

এবার একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে ও প্রশ্ন করে, ভয় করছিল না?

আমি একটু হেসে বলি, ভয় করলে কি রিপোর্টারের কাজ করা যায়?

কখনও আমিও প্রথম কথা বলি—ছায়াদি, গতকাল তো আপনাকে দেখলাম না।

—কাল আমার ছেলেটার বড্ড জ্বর হয়েছিল ; তাই আসতে পারিনি।

বছর ঘুরতে ঘুরতেই আমাদের পরিচয় আরো নিবিড় হয়। এখন কেউ আমাকে বাচ্চুবাবু বলে না। আমিও কাউকে 'আপনি' বলি না। ওরা সবাই আমাকে 'তুমি' বলে, আমিও সবাইকে 'তুমি' বলি।

শুধু তাই না। ওরা আমার সব খবর জানে! আমিও ওদের অনেক কথা জানি।

জানি, মিতার বাবা নেই ; বরিশালের দাঙ্গায় মারা গিয়েছেন। দিদিও বিধবা। তিনি দু'টি সন্তান নিয়ে ওদের কাছেই থাকেন। ছোট বোন মাত্র এগার বছরের। সুতরাং পুরো সংসারটাই ওকে একলা টানতে হয়। রেখার অবস্থাও তথৈব চ! তবে আমি ভাবতে পারিনি, পারুল এই বয়সেই বিধবা ও শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িতা। বাবা বেলঘরিয়া ষ্টেশনের কাছে চায়ের দোকান চালিয়ে যা আয় করেন, তা দিয়ে পাঁচজনের সংসার একবেলা চালানোও সম্ভব হয় না। শিখাদির সংসারে শ্বশুর বাড়ি স্বামী-পুত্র তিন ননদ আছে। শ্বশুর ওপার বাংলায় এক কালে মাষ্টারী করলেও এখন জরা ও রোগগ্রস্থ। স্বামী ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তেই এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এখন বেলেঘাটার এক মুদির দোকানে কাজ করেন ভোর ছ'টা থেকে দুপুর দুটো আর বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত কিন্তু মাইনে মোটে পয়ত্রিশ টাকা। শিখাদি আয় না করলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। সবার কাহিনীই এইরকম দুঃখের, বেদনার, দারিদ্রের। সংগ্রামেরও।

ওদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্তা বললেও ম্যাসাজ বাথের কাজকর্ম নিয়ে আমিও কিছু জানতে চাই না, ওরাও কিছু বলে না। আলোচনা হয় না ওদের পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে। তবে আমি আমার টেবিলে বসে বা প্রেসের মধ্যে কাজকর্ম করতে করতেই দেখি, অফিস ফেরত অনেক বাবু আর অফিসাররা ছাড়াও আশেপাশের বা কিছু দূরের অনেক দোকানের মালিকরাই ওদের কাছে আসেন দেহ ও মনের অতৃপ্তি দূর করার জন্য। তবে সব চাইতে হেসে খেলে গলির মধ্যের সব দোকানদার ও আমাদের প্রেসের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই ওরিয়েন্টাল ম্যাসাজ বাথে ঢোকেন ও বেরিয়ে যান, তিনি ঐ পাড়ার সর্বজনপ্রিয় সুচিকিৎসক বিপিন ডাক্তার। তবে মাঝেমধ্যে ছুটিছাটার দিনে বেশ কিছু ছেলেছোকরাকেও আসতে দেখি।

এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে যায়।

বেশ মনে আছে, সেদিন ছিল রবিবার। বাল্যবন্ধু কমল কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে চাকরি পেয়েছে বলে উল্টোডাঙ্গায় ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি। ওদের বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির বারান্দায় দেখি, ছায়াদি ওর ছেলেকে তেল মাখাচ্ছেন। আমি এক গাল হাসি হেসে বলি, ছায়াদি, তুমি এখানে থাকো?

কোনমতে 'হ্যাঁ' বলেই চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে শুধু ইসারায় বললেন, কাউকে কিছু বলো না।

আমি কোন কথা না বলে বন্ধু গৃহে ঢুকি। কমল সঙ্গে সঙ্গে বলল, ছায়াবৌদি যে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে কাজ করেন, তুইও কি সেই ডাক্তারবাবুর কাছে যাস?

আমি কিছু বলার আগেই কমলের বৌদি একটু হেসে বলেন, বাচ্চু ঠাকুরপোর মত রিপোর্টাররা কোথায় যায় না বলতে পারো?

ঠিক সেই সময় কমলের মা ঘরে পা দিয়েই বলেন, বৌমা, বাচ্চু কোথায় যায় বলছো?

—ছায়ার কথা হচ্ছিল। ও যে ডাক্তারবাবুর ওখানে কাজ করে, সেখানে বাচ্চু ঠাকুরপোও যায়।

মাসীমা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বুঝলে বাচ্চু, ছায়ার মত বউ হয় না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মাত্র বছর তিনেক আগেই ওরা ভিখিরী হয়ে ইষ্ট বেঙ্গল থেকে এলো। কি দুঃখে-কষ্টে যে ওদের দিন কেটেছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না। ছায়া সেলাই-ফোড়াই করে আর ওর বর সুবল এই আশেপাশে জনমজুরের কাজ করে কোনমতে সংসার চালাতো।

কমল বলে, ওরা এখানে আসার বছর খানেক পর ঠিক তিন মাসের মধ্যে সুবলদার বাবা মারা গেলেন কলেরায় আর ছোটবোন উল্টোডাঙ্গা ষ্টেশনের কাছেই লরী চাপা পড়ে মারা গেল।

—হা ভগবান!

আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে যায়।

—যাইহোক সুবলদা টিটাগড়ের একটা কারখানায় কাজ পাবার পর ওরা ...মুটি দু'বেলা খেতে পাচ্ছিল কিন্তু বছর খানেক আগে কারখানায় সুবলদা এমন জখম হলো যে শরীরের ডান দিকটা প্যারালিসিস হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী।

—ইস!

মাসীমা বলেন, ছায়া ডাক্তারবাবুর ওখানে কাজ না পেলে ওরা সবাই না খেয়ে মরতো।

—ওদের বাড়িতে কে কে আছেন?

—ছায়ার বুড়ী শাশুড়ী, এক ননদ আর ওদের একটা বাচ্চা আছে।

কমল আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যারে বাচ্চু, ছায়া বৌদি যে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে কাজ করেন, তিনি খুবই ভাল মানুষ, তাই না?

—হ্যাঁ, খুবই ভাল মানুষ।

আমি একটু থেমে বলি, ডাক্তারবাবু তো ছায়াদিকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মত স্নেহ করেন।

পরের দিন সন্ধের দিকে হঠাৎ ছায়াদি ঐ সাপ্তাহিকের অফিসে আমার কাছে এসে হাজির। ওর চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠার ছায়া দেখেই আমি বললাম,

কমলদের বাড়ির সবাই তো তোমাকে খুবই ভালবাসে।

—তা জানি কিন্তু তুমি কি বললে?

—ওরা যখনই বলল, তুমি এক ডাক্তারবাবুর চেম্বারে কাজ করে পুরো সংসারটা সামলাচ্ছো, আমি তখনই বললাম, আমিও ঐ ডাক্তারবাবুর কাছে যাই।...

—আর কি বললে?

—বললাম, ডাক্তারবাবু খুবই ভাল মানুষ আর উনি তোমাকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মতই স্নেহ করেন।

—আর কিছু বলো নি তো?

আমি একটু হেসে বলি, ছায়াদি, তোমার উপকার করার মত ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি বা অমর্যাদা হবে না।

ছায়াদি দু'হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে ছল ছল চোখে বলল, ভাই, তুমি যে আমার কি উপকার করলে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমি সারা জীবনেও তোমাকে ভুলতে পারব না।

ও একটু থেমে বলল, একদিন আমি আমার সব কথা তোমাকে বলব।

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না। দিদিদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছোটভাইদের জানতে নেই। আজ থেকে আমি তোমাকে নতুনদি বলব।

ছায়াদি অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীর পদক্ষেপে আমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। শুধু ঐ সাপ্তাহিকের কাজই ছাড়লাম না, কিছুকাল পরে কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিলাম দিল্লী। দীর্ঘ তিন দশক দিল্লীতে কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম কলকাতা। সাংবাদিকতা ছেড়ে ষোল আনা সাহিত্য চর্চায় মন দিলাম কিন্তু হাতে সময় আর পকেটে কিছু টাকা থাকলেই চার দেয়ালের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে বেড়াই আসমুদ্র হিমাচল।

তিন সমুদ্রের এই মিলনতীর্থে এসে নতুনদির দেখা পাবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিবেকানন্দ শিলা দেখে ফিরে আসতেই নতুনদি তপুকে বলল, তুই হোটেলে যা। আমি বাচ্চুর সঙ্গে একটু গল্প করে ঘণ্টা খানেক পর আসছি।

তপু চলে যেতেই নতুনদি পাঁচ-দশ মিনিট টুকটাক কথাবার্তার পর বলল, বাচ্চু, তুমি বোধহয় আমার এই ছোট ছেলেকে দেখোনি, তাই না?

—বোধহয় না।

একটু থেমেই প্রশ্ন করি, তপু কবে হয়েছে? তখনও কি আমি কলকাতায় ছিলাম?

—বোধহয় তখন তুমি দিল্লী চলে গেছো। তপু যখন আমার পেটে চার মাসের, তখনই আমার স্বামী মারা যায়।

নতুনদি আমার একটা হাত ধরে বলে, তপু কিন্তু আমার স্বামীর ছেলে না, ডাক্তারবাবুই ওর জন্মদাতা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমেই বলে, তপু পেটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারবাবু আমাকে ম্যাসাজে বাথ থেকে ছাড়িয়ে নিজের চেম্বারে কাজ দিলেন। তারপর তপু হবার পর জানলাম, ডাক্তারী পড়ার সময় উনি এক সহপাঠিনীকে ভালবাসতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি ওকে বিয়ে না করে অন্য একজনকে বিয়ে করে।

ও প্রায় না থেমেই বলে, সেই দুঃখে উনি সারা জীবনে বিয়েই করেন নি।

—আচ্ছা?

—বাচ্চু, উনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন নি ঠিকই কিন্তু সৎ উপযুক্ত স্বামীর মত ষোল আনা কর্তব্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনি।

—ডাক্তারবাবু ভবানীপুরে যে দোতলা বাড়ি বানিয়ে ছিলেন, তা উনি ছোট ভাইকে দেন ; গাড়িটা দিয়েছিলেন ছোট বোনকে।

—তোমাকে কি দিয়েছিলেন?

নতুনদি একটু হেসে বলে, বাকি সবকিছুই তো আমাকে দিয়েছিলেন।

—বাকি সবকিছু মানে?

—সমস্ত টাকা কড়ি আর বউবাজারের চেম্বার।

ও একটু থেমে বলে, ওর কৃপাতেই ভালভাবে সংসার চালিয়েছি, স্বামীর চিকিৎসা হয়েছে, ননদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলেদের মানুষ করেছি।

—ছেলেরা কে কেমন লেখাপড়া করল? এখন ওরা কি করছে?

—বড় ছেলে ভদ্র-সভ্য হলেও লেখাপড়ায় একদম মাথা ছিল না। ডাক্তারবাবু দু'-দু'জন প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন বলেই কোনক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করে। এখন সে সি-আই-টি রোডে একটা ওষুধের দোকান বেশ ভাল ভাবেই চালাচ্ছে।

—আর তপু?

নতুনদি একটু হেসে বলে, খুব ভালভাবে এম. এস-সি পাশ করে একটা বেশ নাম করা ওষুধের কোম্পানীতে কেমিষ্টের চাকরি করছে।

—ছেলেদের বিয়ে দিয়েছ?

—বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছি। একটা ফুটফুটে সুন্দর নাতিও হয়েছে।

—তপুর বিয়ে দাওনি?

—মেয়ে দেখাশুনা করছি।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, ডাক্তারবাবু কবে মারা গেলেন?

—তপু তখন বারো বছরের।

—ডাক্তারবাবুর চেম্বার নিশ্চয়ই বিক্রি করে দিয়েছ?

নতুনদি মাথা নেড়ে বলল, না। ও ডাক্তারখানা আমি কোনদিন বিক্রি করব না। ঐ ডাক্তারখানায় এখনও একজন ডাক্তার বসে।

—ভাল করেছ।

—সে ডাক্তার কে জানো?

—কে?

—মিতার কথা মনে আছে? আমাদেরই সঙ্গে ঐ নরকে কাজ করতো।

—কি রকম দেখতে ছিল বলো তো?

—যে তোমার সঙ্গে সব থেকে বেশি কথা বলতো, দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল, যার বাবা দাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

—মেডিক্যাল কলেজের একটা ছেলে প্রত্যেক রবিবার শুধু মিতার জন্যই ওখানে আসতো। ডাক্তারী পাশ করেই ও মিতাকে বিয়ে করে। ঐ ছেলেটিকেই আমি চেম্বারটা ছেড়ে দিয়েছি।

—খুব ভাল করেছ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নতুনদি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাচ্চু, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু আমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, মন্দিরে দেবতাদের শুধু মূর্তিই থাকে ; দেবতারা মানুষের রূপ ধরেই এই পৃথিবীতে আগেও এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন।

টুরিস্ট সেন্টার

সরকার বাহাদুরের কি কম ঝামেলা! দেশের লোকের রোজগারের ব্যবস্থা তাকে করতে হয় ; আবার উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থাও তাকেই করতে হবে। তাই তো নির্জন অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র তীরের আনাচে-কানাচে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সন্ধান পেলেই মহামান্য সরকার বাহাদূর ক্লান্ত নগরবাসীর চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ভাষায় টুরিস্ট সেন্টার।

সত্যিই তো, খাটাখাটুনি করে টাকাকড়ি রোজগার করার পর সব মানুষই একটু আরাম চায়, চায় আনন্দ। এ তো চিরকালের কথা। আগে রাজা-মহারাজারা যুদ্ধজয়ের পর শুধু নিজেরাই আনন্দ করতেন না, বিজয়ী সেনাবাহিনীকেও চিত্ত বিনোদনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। আমাদের ধমনীতে দশ জাতের রক্ত তো হাওয়ায় উড়ে আসেনি!

সে যাই হোক, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পরিশ্রম করার পর একটু মনের খোরাক চাইবেই। কেউ দিনের শেষে একমনে একতারায় টান দিয়ে গেয়ে ওঠে 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে', কেউ বা স্বচের গেলাসে চুমুক। যে যেমন!

বড় বড় শহরগুলোর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আনন্দের অফুরন্ত রসদ ও সুযোগ কিন্তু আজকাল আর এসব আনন্দ শহুরে বাবুদের বেশী ভাল লাগে না। শহুরে বাবুরা মাটির ঘরে থাকতে পারেন না, কাঁচা রাস্তায় হাঁটার কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে, পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তা হোক। তবু ঐ সাহেব-বাবুরা মাঝে মধ্যে জঙ্গল-পাহাড় সমুদ্দুরের ধারে কটা দিন কাটাতে চান। এসব জায়গায় কটা দিন না কাটালে নাকি কোট-প্যান্টুলুন পরা শহুরে বাবুদের মেজাজই ঠিক থাকে না। আসল কথা, পকেটে টু পাইস এসে গেলেই বাবুরা আজকাল শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ওভার-টাইম, বোনাস, এল. টি. সি, ডান হাত-বাঁ হাত! কত রকমের রোজগার! খরচ না করে কি শান্তি পাওয়া যায়?

শুধু দূরে না, এই শহরের ধারেকাছেও সরকার বাহাদুর ক্লান্ত নগরবাসীর মনের খোরাক মেটাবার অভিপ্রায়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। এই সব কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আশেপাশের মানুষদেরও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে বলেই মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস। উদ্দেশ্য সাধু, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ করব কেন? এই পর্যটন কেন্দ্র না হলে কি রাখাল কোন জন্মে চাকরি পেত?

পর্যটন কেন্দ্রের জন্য শুধু যে কিছু রিক্সাওয়ালা আর পান-সিগারেটের দোকানের আয় বেড়েছে তা না, আরো অনেকেরই অনেক আয় বেড়েছে। সরকারী পর্যটন কেন্দ্র না হলে কি এই 'আনন্দ নিকেতন' বা অন্যান্য ছোট-মাঝারি হোটেলগুলি গড়ে উঠত? নাকি অতগুলো বেকার মানুষ চাকরি পেত?

রাখালের ডিউটি শেষ হবার মুখেই হঠাৎ ম্যানেজারবাবু ওকে তলব করে বললেন, ওদের রুম নম্বর ফিফটি-ফাইভে নিয়ে যাও।

রাখাল একবার আড়চোখে চেয়ে দেখে। বোধহয় নতুন বিয়ে হয়েছে! বড় জোর বছরখানেক আগে। যাই হোক ম্যানেজারবাবুর হাত থেকে চাবি নিয়েই ও বলল, ও ঘর তো এখুনি খালি হলো!

ম্যানেজারবাবু এ কথার অর্থ বোঝেন। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তুমি ওঁদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি চাদর-টাদর দেবার ব্যবস্থা করছি।

রাখাল সিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েই নতুন অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলল, আপনারা আসুন।

সাত-আট বছর আগে রাখাল যখন প্রথম চাকরিতে ঢোকে, তখনও প্রত্যেকটি অতিথিকে দু'চোখ ভরে দেখত। না দেখে পারত না। পারবে কী করে? গ্রামে কি এত রকমের সাহেব-মেমসাহেব দেখা যায়। অসম্ভব। কল্পনাতীত। এইসব সাহেব-

মেমসাহেবদের দেখতে দেখতে ও ভাবত, শহুরে বাবুদের কত পয়সা! এক রাত্তিরের জন্য এঁরা ঘর ভাড়া দেন পঁচিশ-পঞ্চাশ একশ থেকে চার-পাঁচ শ'। এর পর আছে 'হুইস্কী সোডা আর মুর্গি-মটন।' আরো কত কী! হিসেব করতে গেলেই রাখালের মাথা ঘুরে যেত। মাথা ঘুরবে না? কত সাহেব-মেমসাহেব এখানে একদিনে যা উড়িয়ে যায়, তা দিয়ে ও এক বিঘে ধানের জমি কিনতে পারতো। আর এক বিঘে জমিতে চাষ করতে পারলেই ও প্রায় মন দুই ধান...

—এই বেয়ারা!

রাখাল আপনমনে এই সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। একবার পিছন ফিরে তাকায়।

রুম নম্বর ফিফটির সাহেবকে দরজাটা একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ও জিজ্ঞেস করে, স্যার, আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু শুনে যাও।

রাখাল ঘরে ঢুকতেই সাহেব বালিশের তলা থেকে এক বান্ডিল নোট বের করে একটা একশ টাকার নোট হাতে নিয়ে বাকি টাকা আবার বালিশের নীচে রেখে দেন। এবার উনি একশ টাকার নোটটা রাখালের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, দৌড়ে এক বোতল হুইস্কী এনে দাও তো!

মেমসাহেব দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বসে বসেই বললেন, আবার এক বোতল হুইস্কী আনতে দিচ্ছেন কেন?

—কেন, তুমি আর খাবে না?

মেমসাহেব একটু হেসে বলেন, আমিও খাব না, আপনিও খাবেন না!

জাপানী পুতুলের মত রাখাল দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু জমিজমার হিসাবের বদলে মনে মনে নতুন হিসেব শুরু করে—এরাও তাহলে স্বামী-স্ত্রী না! স্বামী-স্ত্রী না হয়েও ওরা নির্বিবাদে দুটো দিন এক সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন? তা ছাড়া পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের লোকের কি তিরিশ-বত্রিশ বছরের বউ হয়? গ্রামে-গঞ্জে হলেও শহুরে সমাজে কখনই নয়।

যাই হোক এই সাত-আট বছরে রাখালের এই ধরনের হাজার হাজার গেস্ট দেখতে দেখতে এখন আর নতুন গেস্টদের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না। তবে সাহেব-সুবাদের সেবা করার জন্য দেখতেই হয় ; না দেখে উপায় নেই। দু'চোখ বন্ধ করে তো কাজকর্ম করা যায় না!

ঘরের দরজা খুলেই রাখাল সদ্যাগত গেষ্টদের বলে, স্যার, আপনারা একটু বারান্দায় বসুন। আমি এখুনি ঘরদোর ঠিক করে দিচ্ছি।

কলকাতার এই নিকটতম টুরিস্ট সেন্টারের এই 'আনন্দ নিকেতন'-এ গেস্ট আসার বিরাম নেই। শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ-বসন্ত সব সময়। অন্যান্য টুরিস্ট সেন্টারে টুরিস্ট আসার বিশেষ বিশেষ মরশুম আছে। এখানে সে সব বালাই নেই। কলকাতা শহরের বাবুরা ঠিক পাখির মত হঠাৎ উড়ে আসেন, আবার হঠাৎই উড়ে যান। কেউ দু এক ঘণ্টা থাকেন, কেউ বা দু'একদিন ; তবে বারো আনা গেস্টই একটা রাত কাটিয়ে যান। কিন্তু গেস্টরা যখনই যান না কেন, ঘরখানা লণ্ড-ভণ্ড করে যান। মদের বোতল, জাগ, গেলাস সিগারেট-দিশলাইয়ের খালি বাক্স, চানাচুর ভাজা, কাটলেটের টুকরো তো সারা ঘরময় ছাড়িয়ে থাকবেই। কখনো কখনো আরো কত কী! সে সব মুখে আনা যায় না।

যতই মদ খান আর স্ফূর্তি করুন, শহুরে বাবুরা সত্যি হুঁসিয়ার মানুষ। কখনো টাকাকড়ি বা জামাকাপড় তো দূরের কথা, ছেঁড়া চটি বা সাবানের টুকরোটাও ফেলে যান না ; বরং কিছু গেস্ট বোধ হয় ভুল করেই আনন্দ নিকেতনের তোয়ালে নিজেদের ব্যাগে পুরে নেন। তবে কালে কস্মিনে কি রুম বেয়ারাদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে না? কদাচিৎ কখনও বালিশের নীচে দু'দশটা টাকাও জুটে যায় বৈকি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাখাল ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে পিলো কভার-চাদর নিয়ে আসে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে রাখাল সদ্য আগত গেস্টদের কথাবার্তা শোনে।

মেয়েটির চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে ছেলেটি বলল, সামনের ভিউটা কি সুন্দর, তাই না?

মেয়েটি একটু হেসে বলল, এই রকম ভিউ তো বাগবাজার কুমুরটুলির ঘাটে দাঁড়িয়েও দেখা যায়।

—তা ঠিক কিন্তু এই জায়গাটা অনেক বেশী পিসফুল।

—অত দোকান বাজার লোকজন নেই তো! মেয়েটি একটু থেমে বলে, আমরা কিন্তু কাল খুব ভোরের বাসেই ফিরব।

ছেলেটি সিগারেটে টান দিতে গিয়েও টান দেয় না। একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করে, ভোরের বাসেই ফিরব কেন? এসেছি যখন...

মেয়েটি মাঝপথেই ওকে বাধা দেয়, না, না আমাকে ফিরতেই হবে।

রাখাল মনে মনে ভাবে, হয়ত শাশুড়ীর কাছে কচি বাচ্চা রেখে এসেছে বলেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য অত ব্যগ্র কিন্তু একটু পরেই ওর ভুল ভেঙে যায়।

মেয়েটি বলে, মা তো জানেন আমি অসীমার বাড়ি গেছি। যদি সকাল সকাল না ফিরি...

—অসীমাকে একটু টিপে দিয়ে এলে না কেন?

মেয়েটি একটু হেসেই বলে, আমি দুনিয়ার সবাইকে বলে আসব নাকি যে তোমার সঙ্গে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছি?

—না তা না মানে...

চাদর বদলাতে বদলাতে রাখাল ওদের কথা শুনে মনে মনেই বলে, হা ভগবান! এরাই নাকি ভদ্দরলোক?

ঘরদোর পরিষ্কার করে পরিপাটি বিছানা তৈরী হবার পর ঘর থেকে বেরুবার আগে রাখাল বলে, স্যার, আপনারা এবার ঘরে আসুন।

রাখাল ঘর থেকে বারান্দার দিকে পা বাড়াতে না বাড়াতেই ওরা দুজনে ঘরে আসে। ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম তো জানা হলো না।

—স্যার আমার নাম রাখাল।

ছেলেটি একটু হেসে বলে, ছোটবেলায় পড়েছিলাম, রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।

সহজ সরল গ্রামের মানুষ রাখাল। জেলা শহর মেদিনীপুরে বার দুই গিয়েছে কিন্তু আর কোন শহর দেখেনি। কলকাতা তো দূরের কথা! ও তাই শহুরে মানুষদের হেঁয়ালি কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারে না বলেই বলল, স্যার, বাড়িতে জমিজমা-গরু থাকলে কি এই দূর দেশে চাকরি করতে আসি?

—ঐ জল কাদায় বাস করে গরু-বাছুর দেখার চাইতে তো এখানে অনেক সুখে আছো।

—না স্যার, বাপ-ঠাকুরদার ভিটেতে থেকে জমিজমা চাষবাস করে বেঁচে থাকার সুখই আলাদা!

ছেলেটি হিপ পকেট থেকে এক বান্ডিল টাকা বের করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা, আগে বিয়ার আনো তো!

ছেলেটির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মেয়েটি বলল, আই উইল হ্যাভ জিন অ্যান্ড লাইম।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি চারটে জিন অ্যানড লাইম আনো।

রাখাল গ্রামের বাড়িতে থাকার সময় চা খায়নি বললেই চলে। তবে সর্দি-জ্বর হলে ওর বউ মাস্টার মশায়ের মা'র কাছে থেকে একটু চায়ের গুঁড়ো এনে আদা-চা করে দিত। এখানে চাকরি করতে এসে চা খাওয়া শিখেছে ঠিকই কিন্তু এখনও বিকেলের দিকে এক কাপের বেশী দু' কাপ হলেই রাত্তিরে ঘুম আসতে চায় না।

তা হোক। শহুরে বাবুদের সেবা করতে করতে হুইস্কী-টুইস্কীর ব্যাপারে অনেক কিছু শিখেছে। তাই তো ও জিজ্ঞেস করল, স্যার, সোডা আনব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোডা চাই।

—সঙ্গে কি কিছু খাবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছু চাই বৈকি! ছেলেটি পাশ ফিরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, জয়া কী খাবে?

—ফিশ ফিংগার আর প্লেন ফ্লায়েড পটাটো।

শহুরে সাহেবসুবা-বাবুদের সেবা করার কি কম গুণ? গ্রামের পাঠশালায় তিন ক্লাস পড়া বিদ্যে নিয়েও রাখাল আজকাল একটু-আধটু ইংরেজিও শিখেছে। ও জিজ্ঞেস করল, ক'প্লেট ফিশ ফিংগার আনব স্যার?

ছেলেটি না, জয়াই বলল, দু'প্লেট।

ছেলেটি আরো একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিতেই রাখল চলে যায়। মিনিট দশেকের মধ্যেই জিন লাইম সোডা ছাড়াও আইস বাকেট নিয়ে আসে। আইস বাকেট দেখেই জয়া একটু হেসে বলল, খুব ভাল করেছ। আমি আবার আইস ছাড়া খেতেই পারি না।

মেমসাহেবের মন্তব্য শুনে রাখাল মনে মনে খুশি হলেও মুখে শুধু বলে, একটু পরেই ফিশ ফিংগার আর বাকি পয়সা দিয়ে যাচ্ছি।

এখানে আরো পাঁচ ছ'জন বেয়ারা আছে। তারাও গেস্টদের সেবা করতে ত্রুটি করে না। হাজার হোক গেস্টদের খুশি করতে না পারলে কি ভাল টিপস পাওয়া সম্ভব? মোটামুটি সব গেস্টই ওদের টিপস দেন কিন্তু কেউ দু'টাকা কেউ বা পাঁচ দশ। তবে গেস্টদের যাবার সময় যে বেয়ারা ডিউটিতে থাকে, তার কপালেই টিপসটা জুটে যায়। ভাগ্যের কথা এখানে দিনরাত্তির চব্বিশ ঘণ্টাই গেস্টদের আসা-যাওয়া লেগে আছে। কেউ কেউ দুপুর বারোটা-একটায় এসে তিনটে চারটের মধ্যেই চলে যান ; কোন কোন গেস্ট আবার বন্ধুর বিয়েতে বাসর জাগার নাম করে এখানে নিজেরাই বাসর জেগে ভোরবেলায় কলকাতা ফিরে যান। যাই হোক সব বেয়ারাদেরই শুধু মাইনের টাকায় কুলায় না ; সবারই অভাব আছে কিন্তু রাখালের প্রয়োজন একটু বেশী। দেশের বাড়িতে সাতটা প্রাণী তো ওরই আয়ের উপর বেঁচে আছে।

ফিশ ফিংগার আর বাকি টাকাকড়ি সেন্টার টেবিলের উপর রাখতেই জয়া জিনের গেলাসে একটা চুমুক দিয়েই জিজ্ঞেস করল, রাখাল, তোমার দেশ কোথায়?

—আজ্ঞে মেদিনীপুর।

—তুমি বিয়ে করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেমেয়ে আছে?

—আজ্ঞে দুটো বেঁচে আছে, দুটো মারা গেছে।

জয়া জিনের গেলাস মুখের কাছে নিয়েও চুমুক দেয় না। বোধহয় দিতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, ঐ বাচ্চা দুটোর কী হয়েছিল?

সে সর্বনাশের কথা রাখাল ইহজীবনে ভুলতে পারবে না। এখনও একটু অবসর পেলেই ও শুধু সেদিনের কথাই ভাবে। না ভেবে পারে না। ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা দুটো ভিজে ওঠে। কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অবশ্য অন্য কথা। তবে সাহেবসুবাদের টাকা ওড়ান দেখে ওর প্রায়ই মনে হয়, এর অর্ধেক বা সিকি টাকা হলেই ও ঘরখানা মেরামত করতে পারতো।...

জয়া আবার প্রশ্ন করে, কী হলো রাখাল? তোমার বাচ্চা দুটোর কী হয়েছিল বললে না?

রাখাল কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেও দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা লুকোতে পারে না। দুটো ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। তবু বলে, সে দুঃখের কথা আর কী বলব মেমসাহেব। ঘরের তলায় চাপা পড়ে দুটো জলজ্যান্ত ছেলে মারা গেল।

—সে কী?

রাখাল শুধু মাথা নাড়ে।

শুধু জয়া না, ছেলেটিও জিনের গেলাস নামিয়ে রাখে।

—সমুদ্দুরের ধারে তো আমাদের গ্রাম। তাই বড্ড বেশী জল-ঝড় হয়। শত-খানেক টাকার অভাবে ঘরখানা মেরামত করতে পারলাম না বলেই এ সর্বনাশ হলো।

রাখাল মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে কিছু বলে না কিন্তু জয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সারা মন ভরে যায়। এ বিশ্ব সংসারে সবাই নিজেকে নিয়ে শুধু ব্যস্ত নয়, প্রায় মত্ত! নিজের সুখ-দুঃখ শখ-আনন্দ নিয়ে বিভোর। এই 'আনন্দ নিকেতন'-এ কত ধরনের কত মানুষ আসা-যাওয়া করেন। ষোল আনা না হলেও পনের আনা গেস্টই কলকাতার পরিচিত মানুষদের চোখের আড়ালে এখানে এসে অবৈধভাবে তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করেন। যেসব হতভাগ্য মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিবারাত তাঁদের সেবা করেন, তাদের সুখ-দুঃখের খবর কে নেয়? ফুরসত কোথায়? প্রয়োজনই বা কী? এই সাত-আট বছরের মধ্যে জয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি রাখালের সুখ দুঃখের কথা জানতে চাইলেন। অন্য জন শীলাদি।...

বছর পাঁচেক আগে এক ডাক্তারবাবুর গাড়ি এসে 'আনন্দ নিকেতন'-এর সামনে থামল। সঙ্গে ড্রাইভার ছাড়াও একজন নার্স ও দুটি বাচ্চা। ড্রাইভারের জন্য একতলার ঘর বুক করা হলো ; এ ছাড়া দুটি এয়ার-কণ্ডিশনড ঘর। তার একটা ঘর ডাক্তারবাবুর ; অন্যটি নার্স ও দুটি বাচ্চার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'আনন্দ নিকেতন'-এর সবাই জানলেন, ডাক্তারবাবু নার্সকে নিয়ে স্ফূর্তি করার জন্যই এখানে আগমন করেছেন কিন্তু তার জন্য কেউই বিস্মিত হলেন না। এখানে এ ধরনের ঘটনা না ঘটলেই বোধহয় সবাই বিস্মিত হতেন। ডাক্তারবাবুর এই প্রীতিধন্যা নার্সই শীলাদি।

গেস্টরা যত চালাকই হন না কেন তাদের গোপন খবর জানতে হোটেলের কর্মীদের জুড়ি পাওয়া দায়। রাত কাটতে না কাটতেই ম্যানেজার সুব্রতবাবু ছাড়াও এই আনন্দ নিকেতনের আরো কয়েকজন জেনে গেলেন, না, অন্যান্য গেস্টদের মত ডাক্তারবাবু খাতায় মিথ্যা নাম ঠিকানা লেখেননি। আর জানা গেল ডাক্তারবাবু বিপত্নীক এবং শীলার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক থাকলেও উনি সত্যি ভাল মানুষ।

সেবার দু'দিন থেকেই ওঁরা চলে গেলেন কিন্তু তারপর থেকে ওরা নিয়মিত আসেন। প্রতি মাসে দু'বার না হলেও এক একবার এসে দুটো দিন নিশ্চয়ই কাটাবেন। এখন ওঁদের গাড়ি এসে আনন্দ নিকেতনের সামনে থামার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার সুব্রতবাবু হাসি মুখে অভ্যর্থনা করেন, আসুন ডাক্তারদা, আসুন।

ডাক্তারবাবু ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে নীচে নেমেই বলেন, আগে তোমার মেয়ের খবর বলো।

—ও ভালই আছে ডাক্তারদা।

—ও ভাল থাকবে জানতাম কিন্তু ও বড্ড অ্যানিমিক। শীলার কাছে একটা টনিক আছে। ঐ টনিকটা এখন রেগুলারলি খাইয়ে যাও।

সুব্রতবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

এবার দু'পা এগিয়ে রিসেপসন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, বুঝলে সুব্রত, একটু বয়স্ক লোকের শরীর খারাপ হলে তেমন ক্ষতি হয় না কিন্তু বাচ্চাদের অতি সাধারণ অসুখ-বিসুখের ঠিক মত চিকিৎসা না হলে ওদের সারা জীবন ভুগতে হয়।

ঐ রকম দু'চারটে কথাবার্তা বলেই ডাক্তারবাবু উপরের ঘরে চলে যান। আর নীচে নামেন না। এই আনন্দ নিকেতন ছেড়ে যাবার সময়ই উনি আবার ঘর থেকে বেরুবেন। শীলাদি বলেন, আপনি বিশ্বাস করবেন না সুব্রতদা, উনি রোজ ষোল-সতের ঘণ্টা পরিশ্রম করেন।

সুব্রতবাবু অবাক হয়ে বলেন, সে কী? একটু থেমে বলেন, আপনি বারণ করেন না কেন?

শীলাদি একটু ম্লান হেসে বলেন, হাজার হোক আমি ওঁর নার্স। আমি কোন অধিকারে ওঁকে পরামর্শ দেব?

অসংখ্য বিচিত্র গেস্ট দেখার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজার সুব্রতবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। চুপ করে থাকেন। এ প্রশ্নের জবাব শীলাদি নিজেই দেন, যদি কোনদিন আপনাদের ডাক্তারদা আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন, তাহলে সেদিন নিশ্চয়ই এত পরিশ্রম করতে বারণ করব।

রাত অনেক হয়েছিল। নাইট ডিউটির রিসেপসন কাউন্টারের ক্লার্ক-কাম-রিসেপসনিস্ট সরল ঘোষ খেতে গেছেন। তাই সুব্রতবাবু নিজেই আছেন। কে বা কারা কখন চলে যান বা এসে পড়েন, তার তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদিকে শীলাদি বাচ্চা দুটিকে অনেক আগেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারবাবুও একটা গল্পের বই পড়ছেন। তাই উনিও নীচে এসে গল্প করছেন। আশেপাশে আর কেউ নেই।

রাস্তার ওপাশেই গঙ্গা কিন্তু অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তবু সেই অন্ধকারের বুক থেকে দৃষ্টিটা গুটিয়ে এনে শীলাদি ঠোঁটের কোণায় বিষণ্ণ হাসির সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, আপনি তো ভাল করেই জানেন, এ সংসারে অসংখ্য মানুষ অবৈধভাবে আনন্দ করে। এইসব আনন্দ উপভোগ করে পুরুষদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা বলতে পারব না কিন্তু মেয়েরা সামাজিক স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য হাজার আনন্দ করেও ঠিক মানসিক তৃপ্তি পায় না।

সুব্রতবাবু ওর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। ওকে যেন আরো ভাল লাগে। পদ্ম বা গোলাপের মত আভিজাত্য না থাকলেও শিউলি বা অপরাজিতা ঘরের পাশে যে আনন্দমেলা বসায়, তাকে কার না ভাল লাগে? শীলাদি যেন তেমনি ঘরের পাশের শিউলি, হাতের কাছের অপরাজিতা। সে অনাহূতা হলেও অনাদৃতা কখনই নয়।

শুধু ম্যানেজার সুব্রতবাবুর সঙ্গে না, এই আনন্দ নিকেতনের সবার সঙ্গেই ওর ভাব। ঘরের সামনে দিয়ে রাখালকে চলে যেতে দেখেই শীলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ডাক দেন, রাখালদা, একটু শুনে যাও না!

রাখাল সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে এসে বলে, বলুন মেমসাহেব।

শীলা একটু রাগ করেই বলেন, আবার তুমি আমাকে মেমসাহেব বলেছ?

রাখাল এক গাল হাসি হেসে বলে, কী করব দিদি, অভ্যেস হয়ে গেছে।

—তাই বলে ভাইবোনদেরও কি তুমি...

ওকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই রাখাল হাসতে হাসতেই বলে, যেসব কচিকচি ছেলেমেয়েরা আসে তাদেরও তো সাহেব মেমসাহেব বলি...

—ওদের যা ইচ্ছে বলে ডেকো কিন্তু ভুল করেও আমাকে মেমসাহেব বলবে না।

যাই হোক এই শীলাদির কাছেই রাখাল ওর দুঃখের কথা প্রথম বলে, না বলে কোন উপায় ছিল না। এমন সময় ও শীলাদির কাছে ধরা পড়ে যে কিছুতেই লুকোতে পারল না।

দু'দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আষাঢ় শ্রাবণে তো বৃষ্টি হবেই কিন্তু এই বৃষ্টির জন্যই বোধ হয় শহুরে বাবুরা ঘর ছেড়ে বেরুতে পারছেন না। আনন্দ নিকেতন প্রায় খালি। বেহালার একটি কারখানার কয়েকজন কর্মী দু'দিন ধরে এখানে দিবারাত্র পান করার পর সেদিন সকালেই চলে গেছেন। দোতলার একখানি ঘরে ঘোষবাবু একজন নতুন সখী নিয়ে ইলিশ মাছ খাবার লোভে এই দুপুরবেলায় এসেছেন। ঘোষবাবু গহনার দোকান চালাতে চালাতে ক্লান্ত বোধ করলেই এক একবার এক একজন সখীকে নিয়ে পবিত্র গঙ্গাতীরে দু'এক রাত্তির কাটিয়ে যান। তিনতলায় একখানি ঘরের বুকিং ছিল কিন্তু তাঁরা আসেননি। এই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে রাত দশটা সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারবাবুর গাড়ি এসে থামতেই সুব্রতবাবু ও আনন্দ নিকেতনের আরো দু'তিনজন কর্মী আনন্দে খুশিতে ভরে গেলেন। পুরনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টুকটাক খুটিমিটি হয়ই কিন্তু কখনও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার পর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান বা চলে যেতে বলা হয়। ঐ দু'একদিনই! তারপর স্ত্রীও বাপের বাড়িতে থাকতে পারেন না, স্বামীও একলা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠেন। হোটেলের কর্মচারীরাও ঠিক রকম। গেস্টদের জ্বালাতন অসহ্য হয় কিন্তু গেস্ট শূন্য হোটেলেও তারা কল্পনা করতে পারেন না। সেদিন মাঝরাত্তিরেই বৃষ্টি থামল। ভোর হতে না হতেই সারা আকাশ আলোয় ভরে গেল।

আনন্দ নিকেতনের সামনের গঙ্গায় সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় গেস্ট আসতে শুরু করল। দু'এক ঘণ্টা পর পর পিল পিল করে যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার আগমন দেখে প্রথমে সবাই খুশি হলেও পরে চিন্তায় পড়লেন। এয়ার-কণ্ডিশনড, নন এ-সি তো দূরের কথা, একে একে সব ঘর ভরে গেল দুপুরের আগেই। ডরমিটরি? না, তাও ভরে গেল। রাখাল মনে মনে ভেবেছিল, আজ অফ নেবে কিন্তু একে হোটেল ভর্তি, তার উপর ডাক্তার সাহেব-শীলাদি আছেন বলে ও আর ম্যানেজার বাবুকে কিছু বলল না। তা ছাড়া বললেও কোন কাজ হতো না। এখন কি কাউকে ছুটি দেওয়া যায়? আরো দু'চারজন রুম বেয়ারা থাকলে সুবিধে হতো।

বেয়ারা! বেয়ারা!

চৌদ্দ নম্বর ঘরের গেস্টদের চিৎকার শুনে সুভাষ ছুটে যেতে না যেতেই এগার নম্বর ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি মিহি গলায় ডাকেন, বেয়ারা, একটু শুনবে?

সুভাষ মেয়েটির কথা শুনতে না শুনতেই চৌদ্দ নম্বরের ভদ্রলোক গর্জে উঠেন, কতক্ষণ ধরে ডাকছি...

রাখাল ছ'টা বিয়ারের বোতল নিয়ে দশ নম্বরে ঢুকে দুটি বোতল রেখেই প্রায় দৌড়ে সাত নম্বরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পাঁচ নম্বরের মেমসাহেব হঠাৎ বেরিয়ে এসে বলল, সাহেব যে হুইস্কীর অর্ডার দিয়েছিলেন, তার কী হলো?

অপরাধীর মত রাখাল বলে, এখুনি আনছি মেমসাহেব!

—এখুনি এখুনি বলে তো ঘণ্টা খানেক পার করে দিল।

রাখাল এ কথার কোন জবাব দেয় না। কী জবাব দেবে? মিনিট দশেক আগেই ওঁরা অর্ডার দিয়েছেন কিন্তু ওঁদের আগে যাঁরা অর্ডার দিয়েছেন, তাঁদের...। ও মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেও মুখে কিছু বলে না। বলতে পারে না। বেয়ারা হয়ে কি সাহেব-মেমসাহেবদের সঙ্গে তর্ক করা যায়? আজ রাখালের মন মেজাজও ভাল নেই। কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তবু সাহেব-মেমসাহেবদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য রসদ জোগাতেই হচ্ছে।

—কী রাখালদা, মুখ এত গম্ভীর কেন?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রাখাল খেয়ালই করেনি শীলাদি নীচে নামছেন। হঠাৎ শীলাদির প্রশ্ন শুনে রাখাল মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, হোটেলে এত গেস্ট! তাই দৌড়ঝাঁপ করতে করতে...

কথা শেষ না করেই রাখাল দু'তিনটে সোডার বোতল আর আইস বাকেট নিয়ে উঠে যায় কিন্তু শীলাদির মনে একটু খটকা থেকে যায়। নীচে নেমে উনি ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা সুব্রতদা, রাখালদার কী হয়েছে?

—বোধহয় শরীরটা ভাল না। উনি একটু থেমে বলেন, ও আজ অফ চেয়েছিল কিন্তু আজ হোটেলের অবস্থা তো দেখছেন! কাউকে অফ দেওয়া তো দূরের কথা, আজ আরো দু'চারজন থাকলে সুবিধে হতো।

শীলাদি মাথা নেড়ে বলেন, আজ ওরা সবাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

সুব্রতবাবু একটু হেসে বলেন, মজা কি জানেন দিদি, যে গেস্ট যত সাধারণই হন না কেন, হোটেলে এলেই তাঁরা বাদশা হয়ে যান।

উনি হেসে বলেন, ঠিক বলেছেন!

এ সংসারে শত-সহস্র-কোটি-কোটি টাকার সম্পদ যুগ যুগ ধরে লুকিয়ে রাখা

যায় কিন্তু মানুষের মনের আনন্দ, চোখের জল লুকিয়ে রাখার চাবিকাঠি বোধহয় কোনদিনই আবিষ্কার হবে না। ঘন কালো শ্রাবণের মেঘ ভেদ করেও যেমন শত-সহস্র-কোটি মাইল দূরের সূর্যের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছবেই, তেমনি সব রকম গাম্ভীর্য-গরিমা-কাঠিন্য ভেদ করেও মানুষের মনের কথা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত একদিন ফেটে পড়বেই। রাখাল তো দূরের কথা, আলেকজান্ডার-নেপোলিয়নও চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারেননি।

সারা দিন তো দূরের কথা, মাঝরাত্তির পর্যন্ত উন্মত্ত গেস্টদের উন্মাদনায় বন্যা বয়ে গেল। শীলাদি ডাক্তার সাহেবের ঘরেই আছেন কিন্তু মাঝে মাঝেই পাশের ঘরে গিয়ে বাচ্চাদের দেখে আসছেন। তখন বোধহয় রাত শেষ হয়ে আসছে। শীলাদি ডাক্তার সাহেবকে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুতে যাবার সময় বারান্দায় বেরুতেই হঠাৎ মানুষের চাপা কান্না শুনে চমকে ওঠেন। একটু ভয়ও পান। মনে হয়, আশেপাশের কোন ঘরে কোন অঘটন ঘটল নাকি? দু' এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একটু সতর্ক হয়ে কান পেতে শোনেন। তারপর আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে যান।

—কে?

সিঁড়ির মুখে একটা ভূতের মত মানুষকে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে দেখেই শীলাদি ভয়ে আঁতকে ওঠেন।

—কে ওখানে?

প্রথমবার জবাব না এলেও এবার ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসে, আজ্ঞে আমি রাখাল।

—রাখালদা!

কাঁদতে কাঁদতেই ও জবাব দেয়, হ্যাঁ দিদি।

শীলাদি তাড়াতাড়ি দু'পা এগিয়ে ওর পাশে এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঘুমোওনি?

—ঘুম এলো না।

—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মুখে না, ও শুধু মাথা নেড়ে জবাব দিল, না।

—তাহলে কাঁদছ কেন?

রাখাল কোন জবাব দেয় না। আরো দু' একবার জিজ্ঞেস করার পর বলল, এমনি।

—এমনি এমনি কি কেউ কাঁদে?

রাখাল আবার নিরুত্তর। শীলাদিও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত রাখাল হাউ-দাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দিদি, ক'বছর আগে এমনি সতেরই আষাঢ়ই ঘরের

তলায় চাপা পড়ে আমার দুটো বাচ্চা মারা যায়।

—সে কী? শীলাদি চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ দিদি! রাখাল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পয়সার অভাবে ঘরখানা মেরামত করতে পারিনি। আমাদের ওখানে জল ঝড় তো লেগেই আছে কিন্তু...

চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাখাল তার দুঃখের কথা সর্বনাশের কাহিনী বলে যায় কিন্তু শীলাদির কানে পৌঁছয় না। উনি স্থবিরের মত নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে যায়, তা কেউই বুঝতে পারেন না। হঠাৎ শীলাদির কানে আসে—জানেন দিদি, সারা দিন তো দূরের কথা, রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত একটু চোখের জল ফেলারও ফুরসত পাইনি।

আবার একটু নীরবতা।

এবার শীলাদির মুখে একটু ম্লান হাসির আভা ফুটে ওঠে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, রাখালদা, আমি মোটর গাড়ি চড়ে আসি, এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে থাকি, কত ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া করি কিন্তু আমার বুকের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টা রাবণের চিতা জ্বলছে।

ওর কথা শুনে রাখল বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকায় কিন্তু রাত্রির এই অন্তিম মুহূর্তের আবছা অন্ধকারে শীলাদি তা খেয়াল করেন না। উনি আপন মনে বলে যান, তুমি ভাবতে পারবে না রাখালদা, মনের মধ্যে কত দুঃখ-কষ্ট থাকলে একটা মেয়ে চরম কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকে।

না, এবার আর উনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। চাপা কান্নায় বুক ভেঙে আসে। ওর চোখে জল দেখে রাখালের কান্না থমকে দাঁড়ায়। বলে, দিদি, কাঁদবেন না।

শীলাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নেন ; তবে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারেন না। বলেন, জানো রাখালদা, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, সুখের মত দুঃখও কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না।

হঠাৎ একটা দরজা খোলার আওয়াজ হতেই ওরা দু'জনেই চোখের জল মুছতে মুছতে মুহূর্তের মধ্যে দু'দিকে চলে যায়।

কয়েক মাস পরের কথা। ম্যানেজার সুব্রতবাবু দুপুরের-ডাকের চিঠিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, ওরে, সাতই অঘ্রাণ শীলাদির সঙ্গে ডাক্তারদার বিয়ে! আমাদের সবার নেমন্তন্ন।

তীর্থযাত্রা

ফেয়ারলি প্লেস রিজার্ভেশন অফিসের সামনে দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিতভাবে বাল্যবন্ধু দিবাকরের সঙ্গে দেখা হতেই আমার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ভেবেছিলাম, কালকা মেলের এ. সি টু-টায়ারে দিব্যি আরামে ঘুমুতে ঘুমুতে যাব কিন্তু ওর পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত সেকেন্ড ক্লাস থ্রী-টায়ারেই রিজার্ভেশন হল। দিবাকর হাসতে হাসতে বলল, তুই ব্যস্ত না থাকলে তোকেও আমাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী নিয়ে যেতাম। ও আমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অপেক্ষা না করেই বলে যায়, এইরকম লম্বা ট্যুরে এক দল হয়ে গেলে অনেক সুবিধে।

কেদার-বদ্রী যাবার জন্য সময়টা প্রশস্ত হলেও এক দল অপরিচিত দাদা-বৌদি-মাসিমা-পিসীমার সহযাত্রী হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকলেও দিবাকরকে বললাম, আগে জানলে নিশ্চয়ই যেতাম। আমার কথা শেষ হতে না হতেই ও বলল, সামনের বছর সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুরে তোকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

এতগুলো মানুষ ও তাদের অসংখ্য বাক্স-পেঁটরা নিয়ে ট্রেনে ওঠার সময় হৈ-হুল্লোড় চিৎকার-চেঁচামেচি অসহনীয় হবে বলেই ট্রেন ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলাম। আমাকে দূর থেকে দেখেই দিবাকর চিৎকার করল, শান্তদা, ও এসে গেছে। তারপর আমি কাছে আসতেই ও বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, এত দেরি করে স্টেশনে আসে? আর একটু হলে তো ট্রেন ফেল করতি। আমি হাতের ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টি দিয়েই বললাম, শুধু শুধু আগে এসে কী করব? এখনও ট্রেন ছাড়ার সাত মিনিট দেরি আছে। আমার কথা শুনে ও বিশেষ খুশি

হল না। বলল, না, না, এত দেরি করে স্টেশনে আসা ঠিক না। ইতিমধ্যে শান্তদা কাছে আসতেই দিবাকর আমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবার পর গর্বের হাসি হেসে বলল, শান্তদা আমাদের পাড়ার রামনাথ বিশ্বাস! সারা দেশটা যে কতবার ঘুরেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। কেদার-বদ্রীই গিয়েছেন তিনবার। দার্জিলিং-সিমলা-নৈনিতাল-ওটি তো আট-দশবার ঘুরে এসেছেন। প্রৌঢ় শান্তদার বিরাট ভুঁড়ির দিকে এক ঝলক দেখে নিয়েই আমি একটু হেসে বলি, নিয়মিত পাহাড়ে চড়েন বলেই বোধহয় ফিগারটা ঠিক রাখতে পেরেছেন। জর্দা-লাঞ্ছিত দাঁতগুলি বের করে সশব্দে হাসতে হাসতে শান্তদা বললেন, ফাঁকি দিয়ে ওভার-টাইমের আয় আর আপনার বৌদির ঐকান্তিক সেবাযত্নই এর জন্য দায়ী। মনে মনে বুঝলাম, আর যাই হোক, শান্তদা মিথ্যাবাদী না।

ট্রেন ছাড়ার পর জানলাম, শান্তদার নেতৃত্বে পাঁচজন বিধবা, ছজন পুরুষ, চারজন বিবাহিতা মহিলা ও দুজন অরক্ষণীয়া কেদার-বদ্রী দর্শনে চলেছেন। সব চাইতে বয়স বেশি নন্দী-পিসিমার। বাষট্টি বছরের বিধবা হলেও চাবুকের মত রোগা লিকলিকে চেহারা। দেখেই মনে হয়, খিটখিটে স্বভাবের কিন্তু কেদার-বদ্রী দর্শনে চলেছেন বলে বড্ড খুশি। দিবাকরের বিধবা পিসিমাকে দেখেই মনে হয়, অত্যন্ত স্নেহশীলা। ঈশ্বর-দর্শনের চাইতে হিমালয় দেখতেই বেশি উৎসাহী। বয়সে নন্দী পিসিমার চাইতে দু এক বছরের ছোট হলেও অত্যন্ত মিশুকে। শান্তদা পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই দেশ ভ্রমণের ব্যাপারে অনর্গল পরামর্শ বিতরণ করতে দেখেই বুঝলাম, কে ওর স্ত্রী। আমি ইসারায় ওকে দেখিয়েই শান্তদাকে বললাম, ইনিই নিশ্চয়ই বৌদি ও আই-টি-ডি-সি-র ভারী চেয়ারম্যান? শান্তদা হো হো করে হেসে বললেন, ঠিক ধরেছেন। একটু থেমে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, ইনি পতির পূণ্যের সতী ভাগীদার হয়ে খুশি হতে পারেন না বলেই সব সময় আমার সহযাত্রী হন।

ডুপ্লিকেট কালকা মেল কলক্যাতার দেড়-দু হাজার টুরিস্টকে নিয়ে উত্তর ভারতের দিকে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে সিগন্যাল না থাকায় থামছে। সিগন্যাল ঢলে পড়ে সবুজ আলো দেখালেই আবার চলছে। ইতিমধ্যে শান্ত বৌদি বকের মত গলা বেঁকিয়ে বললেন, এই শ্যামলী, এবার খাবার-দাবার দিতে শুরু কর। মিনিট পাঁচেক পরে একটি মেয়ে এসে আমার হাতে প্লাসটিকের একটা প্লেট দিতেই দিবাকর আমাকে বলল, এ হচ্ছে রাণু। আমাদের ডেপুটি ফুড মিনিস্টার। খিদে পেলেই শ্যামলী বৌদি বা একে ধরবি। পাশ থেকে শান্তদা বললেন, রাণু মডার্ন হিস্ট্রি নিয়ে এম এ পাশ করলেও ওর খুব ইচ্ছে জার্নালিস্ট হওয়া। তাই আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন শুনে ও খুব খুশি। ও আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চায়।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

রাণু দিবাকরদের হাতে প্লেট দিতে দিতে আমাকে বলল, পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

রাণু আমাদের ক'জনের হাতে প্লেট দিতে না দিতেই স্বয়ং শ্যামলী বৌদি লুচি দিলেন। অন্যদের কিছু না বললেও উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, লজ্জা করবেন না। ক্রিকেট খেলার মত আমরাও এক এক ওভারে ছ'টা করে লুচি দিই।

আমি হাসি। বলি, এই ওভারে আউট না হলে নিশ্চয়ই পরের ওভার খেলব।

—ছি, ছি, ফার্স্ট ওভারেই আউট হবেন কেন?

শামলী বৌদি আর দাঁড়ান না। লুচি দিতে দিতে এগিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে আলুর দম নিয়ে হাজির চিত্রা বৌদি।

আবার লুচি, আবার আলুর দম। তারপর একটি করে রাজভোগ। রাজভোগ মুখে দিতে না দিতেই রাণু জলের গেলাস সামনে ধরল। আমি একটু হেসে শান্তদাকে বলি, কিছুতেই কি সমালোচনা করার সুযোগ দেবেন না?

শান্তদা জবাব দেবার আগেই শান্ত বৌদি পান-জর্দা-সিগারেট-দেশলাই রাখা ছোট্ট একটা প্ল্যাস্টিকের ট্রে আমার সামনে ধরে বললেন, আমাকেও একটু সেবা করার সুযোগ দিন।

আমি সত্যি হাসি চেপে রাখতে পারি না। এতক্ষণ নীরব থাকার পর নীরদদা বললেন, দেখছেন তো, কেমন রাধা-কেষ্টর হাতে আমরা নিজেদের সমর্পণ করেছি?

বৃদ্ধা পিসিমাদের সামনে এবাবে সিগারেট বিতরণ করতে দেখে দিবাকরের কানে ফিস ফিস করে কিছু বলতে দেখেই নন্দী পিসিমা হাসতে হাসতে বলেন, ওরে বাপু, অত ফিস ফিস করতে হবে না। দেশ ঘুরতে হলে অত বাচবিচার করলে চলে না। গুরুজনদের সামনে পান-জর্দা খেলে যদি অন্যায় না হয়, তাহলে বিড়ি-সিগারেট খেলেও অন্যায় হবে না।

এবার নীরদদা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এ পিসী সে পিসী না!

—তাই তো দেখছি।

এবার নন্দী পিসিমা আমাকে বলেন, শান্তদের সঙ্গে বেরুলে কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না কিন্তু আমার এমনই কপাল যে কোনবার ছেলেদের জন্য, কোনবার নিজেই শরীরের জন্য বেরুতে পারিনি। উনি প্রায় না থেমেই বলেন, এই তো গতবার দ্বারকা যাব বলে সব ঠিকঠাক কিন্তু রওনা হবার দু'দিন আগে এমন ডেঙ্গু জ্বর শুরু হল যে শেষ পর্যন্ত টিকিট ফেরৎ দিতে হল।

আমি বললাম, কী আর করবেন? অসুখ বিসুখের উপর তো কারুর হাত নেই।

নন্দী পিসিমা দুটি নয়ন মুদ্রিত করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাবার কৃপায় এবার তো শরীরটা এখনও পর্যন্ত বেশ ভালই আছে। আশা করি, এবার দর্শন পাব।

—নিশ্চয়ই পাবেন।

—তাই বল বাবা!

তিন-সাড়ে তিনঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকার পর সবাই একটু নড়াচড়া করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। দিবাকর বোধহয় ওর স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে গেল। নীরদদা প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরতে গিয়ে বোধহয় কারুর সঙ্গে গল্প করছেন। নন্দী পিসিমা উঠে গেলেন শান্ত বৌদির পাশে। দলপতি শান্তদা বললেন, একবার সবাইকে দেখে আসি।

—হ্যাঁ যান।

আমি সিগারেট ধরাতেই দেখি, সামনে শ্যামলী বৌদি, পিছনে রাণু। উনি হাসি চেপে বললেন, সবাই আপনাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন দেখে ভীষণ মায়া হল। তাই আমরাই এলাম আপনার কাছে।

আমি প্রায় মনে মনে গেয়ে উঠি, তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি।

শ্যামলী বৌদি পাশে বসতে বসতে বললেন, বেশ রসিক আছেন তো!

—সংসর্গ দোষে রসিক হয়েছি : আমি রসিক না।

রাণু শ্যামলী বৌদির ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

—কোথায়?

—কেদার-বদ্রী।

মাথা নেড়ে বললাম, অত সৌভাগ্য কপালে সইবে না।

শ্যামলী বৌদি বললেন, সত্যি চলুন না। খুব আনন্দ হবে।

—না বৌদি, আমাকে এখন দিল্লীতেই থাকতে হবে।

—দিন দশেকের তো ব্যাপার। কোনমতে ম্যানেজ করতে পারেন না?

অক্ষমতার কথা আবার জানিয়ে বলি, আগে জানলে নিশ্চয়ই যেতাম। যদি পারি সামনের বছর আপনাদের সঙ্গে বেরুব।

ওদিকে পিসিমাদের আপার ব্যাঙ্কে চড়িয়ে দিয়ে তাসের আড্ডা জমেছে। কেউ কেউ আমাদের মত গল্পগুজব বা হাসিঠাট্টা করছেন। ডুপ্লিকেট কালকা মেল কখনও ছুটছে, কখনও থামছে। রাত আরো একটু গভীর হয়।

—সারা বছর সংসার ঠেলতে ঠেলতে হাঁপিয়ে উঠি। তবু বছরে এই কটা দিন ঘুরি বলে বেঁচে আছি। শ্যামলী বৌদি চলন্ত ট্রেনের দুরন্ত হাওয়ার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কথাগুলি বলেন।

রাণু বলল, দিন দিন কলকাতার বা অবস্থা হচ্ছে তাতে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। বছরে দু একবার না বেরুলে পাগল হয়ে যেতে হয়।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বলি, ঠিক বলেছেন।

নানা বিষয়ে টুকটাক আলাপ-আলোচনার পর আমি জানতে চাই, আপনারা কি শুধু তীর্থক্ষেত্রেই বেড়াতে যান?

শ্যামলী বৌদি ঠোঁট উল্টে একটু হেসে বলেন, আসল কথা সংসারের একঘেয়ে জীবন থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্য বেরোই কিন্তু বুড়ো-বুড়িদের কাছে তীর্থক্ষেত্রের কথা না বললে তো মত পাব না।

রাণুও ওকে সমর্থ জানিয়ে বলে, সত্যি তাই। আমরা অন্যায় করি না, তীর্থও করতে চাই না। ও একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয় আশেপাশে কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, সংসারে যারা যত বেশি অশান্তি সৃষ্টি করে, তারা তত বেশি ধার্মিক হয়।

আমি হাসি। শ্যামলী বৌদি বলেন, ঠিক বলেছিস।

—আমি আবার বেঠিক কথা কবে বলি? রাণু একটু মুচকি হেসে বলে, তোমার মাসী শাশুড়ী আমার হাতে পড়লে দুদিনে ঠিক করে দিতাম।

—চুপ কর, চুপ কর! বুড়ী শুনলে আমার পিণ্ডি চটকে দেবে।

এবার আমি জানতে চাই, আপনার মাসী শাশুড়ীও বুঝি এই পার্টিতে আছেন?

শ্যামলী বৌদি জবাব দেবার আগেই রাণু বলল, ঐ যে নন্দী পিসীমা, উনিই হচ্ছেন...

—উনি বুঝি খুব কড়া শাশুড়ী?

শ্যামলী বৌদি বলেন, কড়া হলে দুঃখ ছিল না কিন্তু উনি অযথা সবার সব ব্যাপারে নাক গলিয়ে এমন অশান্তি সৃষ্টি করেন যে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—আমি তো ভেবেছিলাম, উনি খুব ধার্মিক ও ভাল মানুষ।

—বাইরের মানুষের কাছে উনি সত্যি ভাল মানুষ কিন্তু ওর ছেলেমেয়ে, পুত্রবধু, জামাই আর আমরা মর্মে মর্মে জানি উনি কী জিনিস। শ্যামলী বৌদি একটু থেমে বলেন, সত্যিকার ভাল মানুষ হচ্ছে দিবাকরদার পিসী। উনি আমাদের পাড়ায় থাকেন না কিন্তু সবাই ওকে এত পছন্দ করে যে আমরা প্রায় জোর করেই ওকে সঙ্গে নিই।

ইতিমধ্যে শান্ত বৌদি আমার পাশে এসে বসতেই শ্যামলী বৌদি বলেন, তবে

শান্তদা আর এই দিদি না হলে আমাদের কারুরই সংসার ছেড়ে বেরোন হত না।

—তা বুঝতে পেরেছি।

শান্ত বৌদি আমাকে বলেন, বলুন ভাই, আমরা সবাই তো সারা বছর ধরে দুঃখ-কষ্ট আর অশান্তি ভোগ করি। বছরে এই কটা দিন একটু আনন্দ না করলে আমরা বাঁচব কী করে?

—সে তো একশ বার।

আরো কত কথা, কত গল্প হয়। আমার কথা বলি, ওদের কথা শুনি। ডুপ্লিকেট কালকা মেল কখনো চলে, কখনো থামে। রাত আরো গভীর হয়। ওদিকে তাসের আড্ডা ভাঙে, আমাদের বৈঠকও শেষ হয়। একে একে আমরা শুয়ে পড়ি।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলে আবিষ্কার হল, ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট চলছে। এই আবিষ্কারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়তেই নন্দী পিসিমা বললেন, পোড়ার মুখোদের ঝাঁটা মারতে হয়। কড়ায়-গণ্ডায় ভাড়া নেবে অথচ ঠিক সময় গাড়ি চালাতে পারে না।

শান্তদা হাসতে হাসতে বললেন, পিসিমা, আমাদের মিনিবাস রোজ ডালহৌসি পৌঁছতেই আধঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে ; আর পাঁচশ মাইল আসতে রেলগাড়ী দুতিন ঘণ্টা দেরি করবে না?

দিবাকর বলল, হঠাৎ ইঞ্জিন খারাপ হলে ওরা কী করবে?

মোগলসরাইতে নতুন ইঞ্জিন লাগার পর ট্রেন সত্যি জোরে চলছে কিন্তু তবু এলাহাবাদ পৌঁছতে পৌঁছতেই বেশ বেলা হল। ফতেপুর আসার আগেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটল। গরম হাওয়ায় মুখ-হাত যেন ঝলসে যাচ্ছিল। অনেকেই জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। তাসের আড্ডা বসল কিন্তু বেশীক্ষণ চলল না। শান্তদা বললেন, না ভাই, এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। আজই যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আর কেদার-বদ্রী পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না। জানলাগুলো বন্ধ করে ওরাও শুয়ে পড়লেন। আমরা যারা জেগে রইলাম, তারা কানপুরে গাড়ি থামলে প্ল্যাটফরমের কলে চোখে-মুখে জল দিয়ে কোলড্রিংক খেলাম।

এটাবা, শিকোয়াবাদ, ফিরোজাবাদ পার হলাম কিন্তু গরমের ভয়ে কেউই দরজা-জানালা খুলি না কিন্তু দুটি কুজোর জল শেষ হওয়ায় আমরা সবাই প্রায় বাধ্য হয়ে টুণ্ডুলায় নামি। সূর্য তখন বেশ খানিকটা ঢলে পড়লেও তখনো 'প্রখর তপনতাপে আকাশ তুষার কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার।'

আমাদের কম্পার্টমেন্টের একটু ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, ছোট একটা ছেলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা ভাগ্যবান যাত্রীদের দেখছিল। হঠাৎ নন্দী পিসিমা ওকে ডাক দিলেন, এই ল্যাড়কা, শোন, শোন। ছেলেটি

ভয়ে ভয়ে ভয়ে দু'এক পা এগুতেই নন্দী পিসিমা একটা পিতলের ঘটি ওর হাতে দিয়ে বললেন, জলদি জল আন।

ভাগ্যবতী যাত্রীর সেবা করার সুযোগ পেয়ে ছেলেটি যেন হঠাৎ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করল। পিতলের ঘটি নিয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঐ দূরের কল থেকে জল ভরে পিসিমার হাতে দিল। পিসিমা খুশি হয়ে বললেন, তুমি বহুত আচ্ছা ল্যাড়কা।

ছেলেটি শুনে খুশি হলেও হাসতে বা সামান্য বখশিস চাইতে যেন সাহস করে না।

—তোর কিয়া নাম?

—মসরুদ্দীন।

নন্দী পিসিমার মুখে যেন কেউ কালি লেপে দিল। ঘটির জল ফেলে দিতে দিতে উনি মুখ বিকৃতি করে বললেন, দুর হারামজাদা! আর একটু হলেই জাত খেয়েছিলি আর কি!

নিষ্পাপ শিশুটি বিষণ্ণ বিবর্ণ স্তম্ভিত হয়ে তীর্থযাত্রী নন্দী পিসিমার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাস খানেক পর দিবাকরের চিঠিতে জেনেছিলাম, হরিদ্বার স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়ার নন্দী পিসিমার ডান পায়ের হাড় ভাঙে। প্লাসটার করার পর পিসিমাকে দ্বিজদাস পাণ্ডার হেপাজতে রেখে ওরা কেদার-বদ্রী ঘুরে ভালভাবেই কলকাতা ফিরে গেছে।

আমি মনে মনে কেদার-বদ্রীর উদ্দেশ্যে প্রণাম না জানিয়ে পারি না।

গল্প

পবিত্র চিরকাল স্বপ্ন দেখত সে সাহিত্যিক হবে। সব জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প-উপন্যাস ছাপা হবে। বড় বড় প্রকাশকদের ঘর থেকে সে সব বই প্রকাশিত হবে ও লক্ষাধিক প্রচারিত দৈনিক-সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় তাদের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

শুধু তাই নয়।

পবিত্র আরো স্বপ্ন দেখত। পথেঘাটে মানুষজন তাঁকে সমীহ করবে। সভা-সমিতিতে অসংখ্য ছেলে মেয়েরা অটোগ্রাফের জন্য তাঁকে ঘিরে ধরবে। আরো কত কি! স্বপ্ন দেখার কী শেষ আছে।

শেষ পর্যন্ত এম, এ পাশ করার পর পবিত্র বনগাঁ কলেজে বাংলার লেকচারার হলো। তারপর একদিন সায়েন্স কলেজের ডক্টর সরকারের সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে অরুন্ধতীর সঙ্গে তাঁর বিয়েও হলো। নিছক ইউ-জি-সি স্কেলে বেশী মাইনে পাবার জন্য নয়, ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বোপরি সহকার্মীদের কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য পবিত্র ডক্টরেট হলো। তবু যেন মনে শান্তি নেই।

একদিন অরুন্ধতী বলল, প্রথম বিশী, নারাণ গাঙ্গুলী ও আরো কত বড় বড় সাহিত্যিকই তো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। চেষ্টা করলে তুমিই বা সাহিত্যিক হতে পারবে না কেন?

—তুমি বলছ আমি লিখব?

—নিশ্চয়ই লিখবে। কেন লিখবে না?

একটু চুপ করে থাকার পর পবিত্র বলে, যদি লেখা ভাল না হয়, যদি কাগজের অফিস থেকে লেখা ফেরত পাঠায়?

—তোমার ভাষা আছে, মন আছে, লেখা খারাপ হবে কেন? অরুন্ধতী প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, যদি একটা কাগজ থেকে ফেরত আসে তাহলে অন্য পত্রিকায় পাঠাবে।

—তাহলে লিখব?

—একশ'বার লিখবে। কাল সকাল থেকেই লিখবে। তাছাড়া এখন তো তোমার কলেজও বন্ধ।

পবিত্র অরুন্ধতীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, কাল সকাল থেকেই লিখতে বসব কিন্তু লেখা খারাপ হলে তুমি দায়ী।

অরুন্ধতী একটু হেসে বলে, আমি বাজী রেখে বলতে পারি, তোমার লেখা খারাপ হবে না। তাছাড়া আমি তো আছি। পড়ে যদি দেখি ভাল লাগছে না, তাহলে একটু বদলে দিও।

—সে তো একশ'বার। তুমি ভাল বললে তবেই আমি কাগজে পাঠাব।

সত্যি পরের দিন সকাল বেলায় মুখ-হাত ধুয়ে একটু কিছু মুখে দিয়েই পবিত্র গল্প লিখতে বসে। আগেই মনে মনে ঠিক করেছিল, অনুপম আর নন্দিনীকে নিয়ে লিখবে। অনুপম ওর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে ও ইকনমিক্স নিয়ে পড়েছে। প্রফেসর মিত্রের অন্যতম প্রিয় ছাত্র অনুপম ওরই মেয়ে নন্দিনীকে ভালবাসত। নন্দিনীও কোনদিন ভাবে নি, অনুপম ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তার জীবনে আসবে বা আসতে পারে কিন্তু তবু কত কী ঘটে গেল ওদের জীবনে।

অরুন্ধতী বলেছিল, অনুপমদা আর নন্দিনীর কথা শুনেই চোখে জল এসে যায়। ওদের নিয়ে গল্প লিখলে সবার ভাল লাগতে বাধ্য।

পবিত্র ওদের নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করে। এক পাতা শেষ হতেই দু'তিনবার পড়ে। নিজের মনেই বিচার করে। ভালই লাগে। শুরু করে দ্বিতীয় পাতা।

দ্বিতীয় পাতা শেষ হতে না হতেই অরুন্ধতী চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, দেখি, কী লিখলে।

পবিত্র চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই অরুন্ধতী পড়তে শুরু করে। বিচিত্র উৎকণ্ঠায় পবিত্র ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ অরুন্ধতী এক গাল হাসি হেসে বলে, খুব সুন্দর হচ্ছে।

—সত্যি?

অরুন্ধতী দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমি ভাবতে পারিনি, তুমি

এত সুন্দর লিখতে পারবে। এ গল্প তো...

হঠাৎ খট্ খট্ করে কড়া নাড়ার আওয়াজ হ্যতেই অরুন্ধতী কথাটা শেষ না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই অরুন্ধতী ফিরে এসে বলে, মুকুলবাবু এসেছেন।

—কোন মুকুলবাবু?

অরুন্ধতী একটু হেসে বলে, আমাদের আগের বাড়ির পাশে যে এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক থাকতেন, যার স্ত্রীকে তুমি কলেজে ভর্তি করে দিলে...

—ও!

পবিত্র তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের ঘরে যায়। মুকুলবাবুকে দেখেই প্রশ্ন করে, জয়ন্তীকে অনেক দিন কলেজে দেখি না। ও কী অসুস্থ?

মুকুলবাবু একটু হেসে বলেন, যে খবরটা জানার জন্য এসেছিলাম, তা জানা হয়ে গেল।

পবিত্র একটু অবাক হয়ে বলে, কোন খবর? তার কলেজে না আসার খবর?

—হ্যাঁ

অরুন্ধতী দু'কাপ চা ওদের সামনে রেখে মুকুলবাবুকে জিজ্ঞেস করে, জয়ন্তী কেমন আছে?

—খুব ভাল।

কথাটা শুনে অরুন্ধতীর খটকা লাগে কিন্তু কোন প্রশ্ন না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুকুলবাবু বলেন, জয়ন্তী কলেজে যাবার কথা বলেই রোজ সাত সকালে বেরিয়ে পড়ে। ফেরেও দেরি করে। পিসিমা জিজ্ঞেস করলেই বলে, এক্সট্রা ক্লাশ হচ্ছে বলেই দেরি হয়।

পবিত্র হেসে বলে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খুব আড্ডা দিচ্ছে বোধ হয়।

মুকুলবাবু একটু বিচিত্র হাসি হাসেন। বলেন, জয়ন্তী আর আগের মত নেই।

—তার মানে?

কোন ভূমিকা না করেই উনি শুরু করেন, আমরা সাত ভাইবোন। আমাদের বাড়ি জলপাইগুড়িতে। আমার একমাত্র পিসীমা বিধবা হবার পর পরই তাঁর ছেলেটি মারা যায়। তাছাড়া আমার দু' আড়াই বছর বয়সের সময় মা খুব অসুস্থ হন। সেই তখন থেকে আমি পিসীমার কাছেই মানুষ। পিসীমাকে তো আপনারা দেখেছেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব দেখেছি। উনি তো আমাদের দু'জনকেও অত্যন্ত স্নেহ করেন।

—সত্যি আমার পিসীমার কোন তুলনা হয় না।

—ঠিক বলেছেন।

মুকুলবাবু বলে যান, পিসীমা আমার বন্ধু-বান্ধবদের কী ভালবাসেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

—হ্যাঁ, আপনার বাড়িতে অনেক বন্ধু-বান্ধবকে আসতে দেখেছি।

মুকুলবাবু একটু ম্লান হেসে বলেন, ওদেরই একজনের সঙ্গে জয়ন্তী বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছে।

—বলেন কী? পবিত্র চমকে ওঠে।

বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ বা উত্তেজনা প্রকাশ না করে উনি বলেন, আমি ভালই রোজগার করি কিন্তু জলপাইগুড়ির সংসার আমাকেই চালাতে হয়। তাছাড়া গত তিন বছর ধরে মা ক্যান্সারে ভুগছেন। গত পাঁচ বছরে দু'বোনের বিয়ে দিয়েছি। অবিলম্বে আর এক বোনের বিয়ে দেওয়া দরকার।

এবার মুকুলবাবু হেসে বলেন, এই সব দায়-দায়িত্ব ও এখানকার সংসার চালিয়ে জয়ন্তীকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা দেওয়া আমার পক্ষে একদমই সম্ভব নয়।

—সে তো একশ' বার সত্যি কিন্তু জয়ন্তী কী ঐ ধরনের মেয়ে?

—জয়ন্তী অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে কিন্তু বড় লোভী।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ প্রফেসর সাহেব, ঠিকই বলছি। আমার বন্ধু ওকে নিয়ে কী করে বা না করে, তা বলতে পারব না কিন্তু বন্ধু ওর পিছনে শুধু টাকা খরচই করে না, হরদম নগদ টাকাও দেয়।

—সত্যি?

মুকুলবাবু হেসে বলেন, ও আজকাল হরদম নিত্যনতুন শাড়ী দেখিয়ে বলে, বন্ধুরা দিয়েছে। তাছাড়া ও অনেককেই টাকা ধার দিচ্ছে।

এবার পবিত্র প্রশ্ন করে, আপনি জানলেন কী করে?

মুকুলবাবু হেসে বলেন, এই তো ক'দিন আগেই আমাদের পাড়ার এক ভদ্রমহিলা জয়ন্তীকে না পেয়ে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, জয়ন্তীকে এই খামটা ফেরত দিয়ে দেবেন ; আর বলবেন, টাকাটা দরকার হলো না বলে যেমন দিয়েছিল, তেমনই ফেরত দিয়ে গেলাম।

উনি একটু থেমে একটু হেসে বলেন, যে খামের মধ্যে টাকা ছিল, সেই খামটাও আমার বন্ধুর কোম্পানীর।

পবিত্র একটু চুপ করে থাকার পর বলে, জয়ন্তী আমার ছাত্রী হলেও আপনার স্ত্রী। তার বিষয়ে এসব কথা আমাকে বলে লাভ কী?

—আপনাকে ও খুব শ্রদ্ধা করে। তাই ভেবেছিলাম আপনি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলেন...

—খুব কঠিন কাজ ; তবু ভেবে দেখি কী করতে পারি।

—একদিন বৌদিকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়িতে।

—আসব।

মুকুলবাবু চলে যেতেই পবিত্র বাড়ির ভিতরে ঢুকে কান্নার শব্দ শুনে চমকে ওঠে। বারান্দায় অরুন্ধতীকে না দেখে ঘরে উঁকি দেয় কিন্তু না, সেখানেও নেই। তারপর রান্নাঘরের দিকে এগুতেই দেখে উঠোনের এক কোণায় বসে লক্ষ্মীর মা কাঁদছে। অরুন্ধতী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পবিত্র কোন কথা না বলে নিজের ঘরে আসে। চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে। কলম নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে গল্পটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেও বাধা পায়। বার বার শুধু মুকুলবাবু আর জয়ন্তীর কথা মনে হয়। তবু দু'চার লাইন লেখে কিন্তু এগুতে পারে না। আবার ওদের কথা ভাবে। না ভেবে পারে না।

এভাবে কতক্ষণ সময় কেটে যায়, তা পবিত্র টের পায় না। হঠাৎ অরুন্ধতী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, উনি কখন গেলেন?

—এই একটু আগে।

—হঠাৎ এসেছিলেন কেন?

পবিত্র একটু গম্ভীর হয়েই বলে, জয়ন্তী নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—কী বলছ তুমি? অরুন্ধতী চমকে ওঠে। তারপর আবার বলে, জয়ন্তী তো সে ধরনের মেয়ে না।

—আমারও তো সেই রকমই ধারণা ছিল কিন্তু মুকুলবাবু বলে গেলেন, ওরই এক বন্ধুর সঙ্গে জয়ন্তী নাকি খুব বেশী জড়িয়ে পড়েছে।

অরুন্ধতী চুপ করে থাকে। পবিত্র আবার বলে, ঐ ভদ্রলোক নাকি জয়ন্তীকে অনেক টাকা কড়িও দিচ্ছেন।

দু'জনেই কিছুক্ষণ কথা বলে না। তারপর অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করে, তা উনি তোমার কাছে কেন এসেছিলেন?

—আমি যদি জয়ন্তীকে বুঝিয়ে...

ওর কথা শেষ হবার আগেই অরুন্ধতী বলে, না, না, তোমাকে কথা বলতে হবে না। আমিই জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলব।

—সেই ভাল।

অরুন্ধতী ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে এসেছি।

দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি।

পবিত্র আবার লেখার চেষ্টা করে। দু'এক লাইন লেখেও কিন্তু তার বেশী এগুতে পারে না। অরুন্ধতী দু'কাপ চা নিয়ে আসে। পবিত্রর পাশে বসে। দু'জনেই চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

অরুন্ধতী বলে, এদিকে লক্ষ্মীর মা দু'দিন কাজ করতে আসে নি কেন জানো?

—কেন?

অরুন্ধতী মাথা নেড়ে যেন স্বগতোক্তি করে, এই হতভাগীদের যেমন কপাল, তেমনই বুদ্ধি।

—হঠাৎ এ কথা বলছ?

অরুন্ধতী শুরু করে, লক্ষ্মীর বাবা তো অনেক আগেই মারা গেছে। এই বছর খানেক আগে লক্ষ্মীর মা হঠাৎ এক রিক্সাওয়ালার সঙ্গে থাকতে শুরু করে। ক'দিন আগে সেই হতভাগা লক্ষ্মীকে নিয়ে পালিয়েছে।

শুনেই পবিত্র চমকে ওঠে, সে কী?

অরুন্ধতী একটু হেসে বলে, তবে আর বলছি কী?

—বাপ হয়ে মেয়েকে নিয়ে পালাল।

—বাপ না কচু। অরুন্ধতী ঠোঁট উল্টে বলে, জোয়ান মদ্দ ব্যাটা ও লক্ষ্মীর লোভেই ওর মাকে নিয়ে গিয়েছিল।

—তুমি ওকে দেখেছ নাকি?

—কতদিন আমাদের এখানে এসেছে।

অরুন্ধতী একটু হেসে বলে, লক্ষ্মী কতদিন ওর রিক্সা চড়ে এসে মাকে এখান থেকে নিয়ে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। অরুন্ধতী একটু থেমে বলে, ঐ হতভাগার সঙ্গে লক্ষ্মীরই বেশী ভাব ছিল কিন্তু ওর মা হাবাগোবা বলে কিছু বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতেই পবিত্র চমকে ওঠে, একি! দু'টো বাজে।

স্নান-খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করতে এসে পবিত্র বলে, বেশ লেখা শুরু করেছিলাম কিন্তু মুকুলবাবু আর লক্ষ্মীর মার জন্য শেষ করতে পারলাম না।

—বিকেল বেলায় চা-টা খেয়ে আবার লিখতে বসো।

—সে তো বসবই।

বিকেল বেলায় চা-টা খেয়ে দু'জনে একটু কথাবার্তা বলছে, এমন সময় জয়ন্তী এসে হাজির। ওরা দু' জনেই অবাক হয়ে যায় কিন্তু প্রকাশ করে না।

অরুন্ধতী হাসতে হাসতেই বলল, এতদিন পর মনে পড়ল আমাদের কথা?

—তোমার আর দাদার কথা সব সময়ই মনে হয় কিন্তু সারাটা দিন এত ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় যে সন্ধ্যের পর আর বেরুতে ইচ্ছে করে না।

জয়ন্তী কথাগুলো বলতে বলতেই পবিত্রকে প্রণাম করে। তারপর বলে, দাদা, আমার বোধহয় আর লেখাপড়া করা সম্ভব হবে না।

পবিত্র জিজ্ঞেস করে, কেন?

—আমি বোধ হয় আবার বাবা-মার কাছে ফিরে যাব।

ওরা দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে, তার মানে?

জয়ন্তী মুখ নীচু করে বলে, গরীবের ঘরে জন্মেছি। বড় দুঃখে কষ্টে মানুষ হয়েছি। এঞ্জিনিয়ার স্বামী পেয়ে ভেবেছিলাম, বেশ সুখেই থাকব, কিন্তু...

জয়ন্তী হঠাৎ থামে।

অরুন্ধতী ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কী ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?

—না।

—তবে এসব সন্দেহ মনে আসছে কেন? অরুন্ধতী না থেমেই বলে, মুকুলবাবুও তো মানুষটি বেশ ভাল।

—হতে পারে ভাল কিন্তু কোন ভদ্রঘরের মেয়ের স্বামী হবার উপযুক্ত নয়।

পবিত্র আর অরুন্ধতী দৃষ্টি বিনিময় করে কিন্তু কোন কথা বলে না। জয়ন্তীও একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমার স্বামীর পিসীমা বলে যাকে আপনারা চেনেন, তিনি আসলে আমার শ্বশুরের রক্ষিতা ছিলেন ও আমার স্বামী এরই গর্ভে জন্মেছে।

—কী বলছ তুমি? পবিত্র একটু জোরেই বলে।

জয়ন্তী একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, দাদা, আমি তো বড়লোকের ঘরের মেয়ে না যে এক স্বামীকে ছেড়ে নতুন স্বামীকে নিয়ে ঘর করব। শুধু শুধু স্বামী-শ্বশুরের নিন্দা করব কেন?

অরুন্ধতী বলল, সে তো একশ'বার।

—অভাব-অনটন সহ্য করা যায় কিন্তু এই গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। জয়ন্তী একটু থেমে বলে, ওদিকে আমার বাবা-মার অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। তাই ওরই এক বন্ধুর অফিসে চাকরি নিয়েছি।

—তাই নাকি? অরুন্ধতি প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ বৌদি। ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ও নিজেও স্বামীর

অফিসে কাজ করে। তাই আমাকে যখন বলল, আমি আর আপত্তি করলাম না।

জয়ন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে তো নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। চাকরি না করে কী করব?

জয়ন্তী যখন উঠল, তখন আটটা বেজে গেছে। ও বেরিয়ে যেতেই পবিত্র একটু হেসে বলল, অনুপমকে নিয়ে আমার গল্প লেখা আর হবে না।

অরুন্ধতীও একটু হাসে। বলে, অনুপমদাকে নিয়ে না লিখে আজ সারা দিনে যা ঘটল, তাই লেখ। দেখবে, সুন্দর একটা গল্প হয়েছে।

—ঠিক বলেছে!

পবিত্র আর এক মুহূর্ত দেরি না করে লিখতে বসে।

লাস্ট ট্রাম

রোজ রাত্তিরে পিসী আমাকে বকাবকি করবেই-বাপ-ভাইকেও দোকানদারি করতে দেখেছি কিন্তু তাই বলে কেউ মাঝ রাত্তিরের পর বাড়ি ফেরেনি।

পিসী থামে না। বলে যায়—গতর খাটিয়ে রান্না করব আর রোজ শুনব, ক্ষিদে নেই। কি যে গিলে আসিস তা ভগবানই জানেন, কিন্তু গন্ধের জ্বালায় ত ঘরে টেঁকা যায় না।

পিসী যতই বকবক করুক, আমি কোন জবাব দিই না। পিসী যে আমাকে মানুষ করেছে। পিসী ছাড়া আমার আর কে আছে? টাকাকড়ি আর দোকানের চাবির গোছা তোশকের তলায় রেখেই জামা-কাপড় বদলে লুঙি পরি। আর দাঁড়াতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ি। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও শুনি পিসী গজগজ করতে—সংসারধর্ম না করলে কি পুরুষ মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে? ঘরে বউ থাকলে দু'দিনে নেশা করা বের করে দিত। পিসী হয়ত আরো অনেকক্ষণ গজ গজ করে কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়ি বলে শুনতে পাই না।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এক গেলাস চা খাই। তারপর বাজার যাই। বাজারের থলি পিসীর হাতে দিয়ে রান্না ঘরের মেঝের উপর দইয়ের ভাঁড় রাখি। সঙ্গে সঙ্গে পিসী বকবক করতে শুরু করে—আমি কী রাক্ষস যে এত শাক-সবজী এনেছিস? তাছাড়া আমি কি এমন লাট সাহেব যে রোজ আমাকে দই-মিষ্টি খেতে হবে?

আমি নিঃশব্দে রান্নাঘরের দরজা থেকে সরে পড়ি। বসুমতীর প্রথম পাতার উপর

দিয়ে চোপ বুলাতে বুলাতেই পিসী এক গেলাস চা দিয়ে যায়। হয়ত সংসারের প্রয়োজনীয় দু'-একটা কথা বলে। তারপর আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে খেয়েদেয়ে চাবির গোছা হাতে নিয়ে পিসীর ঘরের ঠাকুরদেবতার সব ক্যালেন্ডারে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ি। অন্য সব সময় আমাকে বকাবকি করলেও আমি বেরুবার সময় পিসী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বলবে, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। তারপর বলবে, সাবধানে যাস। আর বিকেলে কিছু খেয়ে নিস।

মোড়ের মাথায় শ্রীধরের দোকান থেকে পান খেতে খেতেই কার্তিকের দোকানের পল্টুকে বলি, হ্যাঁরে, পিসীর চাল ফুরিয়ে গেছে। আজই চাল দিয়ে আসিস। তারপর মিনিট দশকে হেঁটে ট্রাম ডিপোয় গিয়ে ফাঁকা ট্রামের জানলার ধারে বসি। দেখতে দেখতে ট্রাম ভরে যায়। চলতে শুরু করে কয়েক মিনিট পরেই।

মোটামুটি এগারটার মধ্যেই দোকান খুলি। হাজার হোক ধর্মতলায় দোকান। অফিসের বাবু আর দিদিরাই খদ্দের। কেনা-বেচা চলে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ছ'টার পরই ভাঁটা পড়তে শুরু করে। সাতটার পর কদাচিৎ একটা-আধটা খদ্দের আসে। তখনই আমাদের একটু হাসি-ঠাট্টা করার সময়। নবকৃষ্ণ আমার দোকানে বসে চা খেতে খেতে বলবে, তুই বিয়ে করিসনি বলেই বোধহয় তোর দোকানে বেশি মেয়ে খদ্দের আসে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, মেয়েরা কী আমাকে দেখেই বুঝতে পারে আমি বিয়ে করিনি?

দ্যাখ চিত্ত, মেয়েরা কি বোঝে, আর কি না বোঝে তা তোর-আমার মাথায় ঢুকবে না।

আশপাশের দোকানের আরও দু'-একজন আমার দোকানে এসে হাজির হয়। নবকৃষ্ণের কথা শুনেই বলাই দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, পুষ্প হারামজাদীকে আমি রোজ টাকা দেব কিন্তু চিত্তর জন্য ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ধর্মতলা পাড়ায় দোকানদারি করতে গিয়ে অনেক আধা-গেরস্থ মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পুষ্প, মলিনা, আরো কয়েকজন আছে যারা পুরোপুরি খারাপও না, ভালও না। বলাই-টলাইরা মাঝে মাঝে ওদের নিয়েই স্ফূর্তি করে। কিছু দেয়। টাকা ছাড়াও সায়া-ব্লাউজ-ফ্রকও দেয় কখনও কখনও। যখন যেমন দরকার। এই মেয়েগুলো আমার দোকানেও আসে। ওদের সবার সঙ্গেই আমার ভাব। তাইতো আমি হেসে বলি, শুধু পুষ্প কেন, অন্য মেয়েগুলোও কি আমাকে কম খাতির করে?

আবার চা-সিঙ্গাড়া আসে। হাসি-ঠাট্টা চলে আরও কিছুক্ষণ। তারপর যে যার

দোকানে ফিরে যায়। আমিও একবার স্টক দেখে নিয়েই ক্যাশবাক্স খুলে হিসেব করতে বসি। একে একে দোকান বন্ধ হয়। বলাই-টলাইরা হয়ত পুষ্পের মত মেয়েদের মধু খেতে যায়। আমরা ক'জন বোতল খুলে বসি শ্রীধরের দোকানের পিছন দিকের ঘরে। স্বর্গরাজ্যের অর্ধেক সিঁড়ি তৈরী করার পর আমাদের আসর ভাঙ্গে। হেলেদুলে ট্রাম ডিপো পর্যন্ত গিয়ে লাস্ট ট্রাম ধরি। রোজ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

সেদিনও লাস্ট ট্রামেই বাড়ি ফিরছিলাম। গেটের সামনেই ফাঁকা লেডিজ সীটে বসলাম। সামনের দিকে আরো দু'-তিনজন প্যাসেঞ্জার। আমার সামনের লম্বা লেডিজ সীটে মাত্র একজন মেয়ে বসে। এত রাত্রে একজন মেয়ে একলা যাচ্ছে দেখে একটু খটকা লাগে। আবার ভাবি, হয়ত টেলিফোন ভবনের কর্মী। রাত এগারটা পর্যন্ত ডিউটি দিয়ে বাড়ি ফিরছেন। অথবা কোন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি ঘুরে ফিরছেন। আবার ভাবি, ধর্মতলা পাড়ায় ব্যবসা করে ফিরছে না তো? মাঝে মাঝে মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় কিন্তু এমন ঘুরে বসেছে যে তা সম্ভব হয় না।

নেশার ঘোরে হঠাৎ একটু ঝিমুনি আসে। হঠাৎ বিকট শব্দ করে ট্রাম থামতেই ঝিমুনি চলে যায়। হঠাৎ দেখি, মলিনা নেমে গেল। মলিনা! চমকে উঠি। তাকিয়ে দেখি, সামনের লেডিস সীট খালি। তবে কী মলিনাই ঐ সীটে বসেছিল? কিন্তু মলিনা তো পার্ক সার্কাসে থাকে। সে এত রাত্রে এদিকে কোথায় গেল? কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে। আবার ভাবি, বেশী নেশা করেছি বলে ভুল দেখিনি তো?

দু'-চারদিন পর বিকেলের দিকে মলিনা দোকানে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, ক'দিন আগে লাস্ট ট্রামে বাড়ি ফেরার সময়...।

মলিনা হেসে বলল,- তুমি বুঝি ঐ ট্রামেই বাড়ি ফিরছিলে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ দুজন খদ্দের আসতেই মলিনা চলে গেল।

পাঁচ-সাতদিন পর আবার ঐ লাস্ট ট্রামে উঠেই দেখি মলিনা। সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে বলে আজ লাস্ট ট্রামে শুধু আমরাই দু'জন যাত্রী। মলিনার পাশে বসেই জিজ্ঞেস করি, এদিকে কোথায় যাও?

মলিনা একটু ম্লান হেসে বলল, মেসোর বাড়ি।

মেসো?

হ্যাঁ, মেসো। মলিনা হেসে জবাব দেয়।

আমি ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তো বলতে তোমার দুই দাদা ছাড়া আর

কোন আত্মীয়স্বজন নেই?

ও আবার একটু হেসে বলে, আগে আমরা এক ভাড়িতেই ভাড়া থাকতাম বলে মেসো বলি।

তাই বলো। একটু থেমেই প্রশ্ন করি, এই মেসো বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসেন?

মলিনা অদ্ভুতভাবে হেসে বলে, পেটের দায়ে মেসোর কাছে যাই।

তার মানে?

ও একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যদি কেউ খেতে-পরতে দিত, তাহলে আর মেসোর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতাম না।

কী বললে?

মলিনা এখন আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, তুমি আমার খাওয়া পরার ভার নেবে? আমি আর কোথাও যাব না।

ওর কথার যেন আমার নেশা ছুটে যায়। একটু ভাবি। তারপর জিজ্ঞেস করি, শুধু খাওয়া-পরার জন্যই কী...।

কথাটা শেষ করতে না দিতেই মলিনা বলে, যার বাপ-মা নেই, যার ভাইরা খেতে-পরতে দেয় না, সে কী না খেয়ে মরবে?

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরেই পিসীকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, একটা গরীব মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে?

পিসী একগাল হাসি হেসে বলল, মেয়েটি দেখতে কেমন?

ভাল।

স্বভাব চরিত্র?

হাসতে হাসতে বললাম, আমার চাইতে খুব বেশি খারাপ না।

পিসী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বললেন, জয় মা দুর্গা!

রাজকুমারীর উইল

পবিত্র জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে রাত ৯/১৮ মিনিট গতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষিতা রাজকুমারী কুসুমকুমারী দেবী ৯৪ বছর বয়সে সজ্ঞানে অমৃতলোক যাত্রা করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গেলেন তিন পুত্র—সৌরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও মানবেন্দ্র, তিন কন্যা—স্বর্ণকুমারী, কৃষ্ণকুমারী এবং সুকুমারী আর সাতটি নাতি-নাতনী ছাড়াও তাদের সন্তানদের।

কুসুমকুমারী দেবী সত্যিই রাজকুমারী ছিলেন। পর পর দুই পুরুষ দত্তক পুত্র গ্রহণ করে রাজশাহী নহাটা রাজপরিবারের বংশ রক্ষার পর রাজা রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর যে সন্তান হয়, তিনিই এই কুসুমকুমারী। সন্তানের জন্ম হবার আনন্দে রাজা রাঘবেন্দ্র সমস্ত প্রজাদের এক বছরের খাজনা মুকুব করে দেন! সে খবর ভারতের রাজধানী কলকাতার সরকারী মহলে পৌঁছবার পর পরই স্বয়ং বড়লাট লর্ড কার্জন রাজা রাঘবেন্দ্র কে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, কন্যা সন্তান হবার আনন্দে তিনি কি এই বছর সরকারী তহবিলে নির্ধারিত রাজস্ব জমা দেবেন না?

রাজা রাঘবেন্দ্র লর্ড কার্জনকে লিখলেন, সন্তানের পিতা হবার গৌরবে ও আনন্দে রাজস্ব বাবদ সরকারী প্রাপ্য ২৮ লাখ ৩৬ হাজার ৩১৫ টাকা ৯ আনা এই পত্রবাহকের সঙ্গেই পাঠাইয়া দিলাম। নির্ধারিত সময়ের সাত মাস পূর্বেই রাজস্ব জমা দিবার জন্য যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি তাহা হইলে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এই অধম জমিদারকে মার্জনা করিবেন।

রাজা রাঘবেন্দ্রের এই চিঠি পেয়ে লর্ড কার্জন শুধু খুশি হন নি, অবাকও

হয়েছিলেন। বড়লাট বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিলেন, মাস খানেকের মধ্যেই রাজশাহী সফরে যাবেন এবং নহাটায় রাজা বাহাদুরের প্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যাকে দেখবেন।

হ্যাঁ, লর্ড কার্জন রাজশাহী গিয়ে রাজা রাঘবেন্দ্রর প্রাসাদে গিয়েছিলেন রাজকুমারীকে দেখতে। সেদিন বড়লাট বাহাদুর রাজা বাহাদুরকে বলেছিলেন, ভারতীয়রা তো শুধু পুত্র সন্তানের জন্মেই খুশি হয় এবং মেয়ে সন্তান হলে দুঃখিত হয় কিন্তু কন্যা সন্তান হওয়ায় আপনার এত আনন্দিত হবার কারণ কী?

রাজা রাঘবেন্দ্র বড়লাট বাহাদুরকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করেছিলেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমার এই কন্যা সন্তান শিক্ষায়-দীক্ষায় আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই কন্যা সন্তানকে আমি ঠিক পুত্রের মত লালন-পালন করবো ও শিক্ষালাভের ষোল আনা সুযোগ দেব।

রাজা রাঘবেন্দ্র তাঁর এই কন্যাকে ঠিক ছেলের মত মানুষ করার জন্য মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে পাঠালেন নিজের স্ত্রী রানী মানদাসুন্দরী ও পাঁচ-সাতজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দাস-দাসীকে। মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একজন ইংরেজ ও দু'জন বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রীকে নিয়োগ করলেন। বিকেলবেলায় কুসুমকুমারীকে নিয়ে যাওয়া হতো ক্যালকাটা ক্লাবে সাঁতার শেখার জন্য। আট-ন বছর বয়স থেকেই রাজকুমারী শুরু করলেন টেনিস খেলা আর সপ্তাহে একদিন ঘোড়ায় চড়া।

রাজশাহীর বিশিষ্ট চিকিৎসক ও রাজা বাহাদুরের স্কুল জীবনের সহপাঠী ডাঃ জগদীশ মুখুজ্যে একদিন কথায় কথায় বললেন, রাঘবেন্দ্র, হাজার হোক কুসুমকুমারী মেয়ে। সে কি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করবে?

রাজা বাহাদুর একটু থেমে বলেছিলেন, দেখো ভাই জগদীশ, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, কুসুমকুমারী বি. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওর হাতে জমিদারী দেখাশুনার ভার দিয়ে দেব। আর জমিদারী ভালভাবে দেখাশুনা করতে হলেই ওকে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করতে হবে। তাই ওকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছি।

উনিশ বছর ছ'মাস বয়সে কুসুমকুমারী যখন বেথুন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরুলেন, তখন উনি কি জানেন না? সাঁতার কাটতে পারেন, টেনিস খেলতে পারেন, ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে বেড়াতে পারেন, সঠিক নিশানায় পিস্তল ছুড়তে পারেন। শুধু তাই না। ইংরেদের সঙ্গে ইংরেজিতেই অনর্গল কথা বলতে পারেন।

হ্যাঁ, কুসুমকুমারীকে দেখে সারা রাজশাহী শহরের মানুষ অবাক হয়েছিলেন।

আর ওদের জমিদারীর প্রজারা মুগ্ধ হয়েছিলেন ওর ব্যবহারে।

তারপর বছর খানেক শিক্ষানবীশী থাকার পর এক শুভদিনের শুভ মুহূর্তে রাঘবেন্দ্র কুসুমকুমারীর হাতে সত্যি সত্যি জমিদারীর দায়-দায়িত্ব সমর্পন করলেন। তখন কুসুমকুমারী ঠিক বাইশ বছরের যুবতী। আর রাজা রাঘবেন্দ্র শুরু করলেন মূল বাল্মিকী রামায়ণের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ।

জমিদারীর ভার গ্রহণ করার পর দিনই রাজকুমারী এস্টেটের ম্যানেজার ও প্রজাদের সাক্ষাৎ যমদূত বৃদ্ধ ঘোষাল মশাইকে বললেন, আমাদের প্রত্যেকটা তালুকের প্রত্যেকটি প্রজার নাম-ধাম-ঠিকানা আর কে কত খাজনা দেয়, তার একটা হিসেব আমার এখুনি চাই।

বৃদ্ধা ঘোষাল মশাই একটু হেসে বললেন, মা জননী, সে তো বিশাল ব্যাপার। সাতটা তালুকে মোটামুটি ভাবে আঠারো হাজার ছোট-বড় প্রজা ছড়িয়ে আছে। তাদের পুরো তালিকা তৈরী করতে হলে তো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

—আমাদের এখানকার সেরেস্তার প্রজাদের রেকর্ড আছে তো?

—হ্যাঁ, মা জননী, আছে।

উনি একটু থেমে বলেন, তবে আমাদের খাতায় হয়তো ঠাকুর্দার নাম আছে কিন্তু আসলে এখন আমাদের প্রজা হচ্ছে ওর নাতি।

—তাহলে মামলা-মোকদ্দমা করতে হলে ঐ মৃত ঠাকুর্দার নামেই...

রাজকুমারীর কথার মাঝখানেই ঘোষাল মশাই জিভ কামড়ে একটু হেসে বলেন, এমন ভুল আমি জীবনেও করিনি।

—সে যাই হোক, প্রত্যেক তালুকের সেরেস্তায় প্রজাদের ঠিক ঠিক রেকর্ড আছে তো?

—একশ বার আছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষাল মশাই বলেন, মা জননী, এবার আমি যাই? এক দল প্রজাকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের এই রাজবাড়িতে যে খরচ-পত্তর হয়, তার হিসেব রাখেন তো?

—অবশ্যই রাখি।

বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবু এক গ্াল হাসি হেসে বললেন, টাকা-আনা-পয়সা তো দূরের কথা, পাই পয়সারও হিসেব রাখতে হয়। তা না হলে কি তোমাদের এই বিশাল জমিদারী চালাতে পারতাম?

—আর হ্যাঁ, সেরেস্তার যে ঘরে বাবা বসতেন, সে ঘর থেকে চৌকি-গদী-তাকিয়া-গড়গড়া সব সরিয়ে চেয়ার-টেবিল দিয়ে আজই ভাল করে সাজিয়ে রাখবেন।

রাজকুমারী প্রায় না থেমেই বলেন, কাল থেকেই আমি ওখানে বসবো।

ম্যানেজারবাবু একটু হেসে বলেন, মা জননী, তুমি সেরেস্তায় বসবে, সে তো আনন্দের কথা কিন্তু ও ঘর থেকে পুরনো আমলের সবকিছু সরিয়ে কালেক্টরী বাবুদের মত চেয়ার-টেবিলে তোমার কাজ করা কি উচিত হবে?

—আমি ফরাসে শুয়ে-বসে তাকিয়া জড়িয়ে তো জমিদারী চালাব না।

—কিন্তু জমিদারীর তো একটা ঐতিহ্য আছে।

—সেই ঐতিহ্য অটুট রাখার জন্যই আমি ভালভাবে জমিদারী চালাতে চাই।

রাজকুমারী মুহূর্তের জন্য থেমে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখুন ম্যানেজারবাবু, একটা কথা আজই আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, যখন প্রয়োজন হবে, আমি নিজেই আপনার পরামর্শ চাইব। উপযাচক হয়ে আমাকে পরামর্শ দেবেন না।

—হ্যাঁ, মা জননী, তাই হবে।

প্রবীণ বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ধীর পদক্ষেপ চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে রাধা-কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করেই রাজকুমারী ঠিক ন'টায় সেরেস্তায় গিয়ে হাজির। শুধু ম্যানেজারবাবু না, সেরেস্তার সমস্ত কর্মচারীরাই মাথা নীচু করে করজোড়ে নমস্কার করে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ম্যানেজারবাবুর পিছন পিছন যথা নির্দিষ্ট ঘরে পা দিয়েই রাজকুমারী এক গাল হাসি হেসে বললেন, বাঃ! চমৎকার সাজিয়েছেন।

ম্যানেজারবাবুও এক গাল হাসি হেসে বলেন, মা জননী, রাজা বাহাদুরদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা মনের কথা বুঝতে পেরেছি বলেই তো তাঁরা আমাকে এই বিশাল জমিদারী চালাবার দায়িত্বে এত বছর রেখেছেন।

—কোন কাগজপত্র সই-সাবুদ করার আছে নাকি?

—রোজই কিছু কাগজপত্র সই-সাবুদ করার থাকে।

—তাহলে সেসব আনুন। চটপট সই করে দিই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ম্যানেজারবাবু এক বান্ডিল কাগজপত্র এনে টেবিলের এক পাশে রেখে একটা কাগজ রাজকুমারীর সামনে রেখে বলেন, মা জননী, নীচে একটা সই করে দাও।

কাগজটার নীচে সই করতে করতেই রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন, ম্যানেজারবাবু, এই তিন হাজার দু'শ একুশ টাকা ছ'আনা কিসে খরচ হয়েছিল?

—মা জননী, শ্রীপুরের এক দল প্রজা এসে রাজা বাহাদুরের কাছে কান্নাকাটি করে বলেছিল, ওদের বড়ই জলের কষ্ট। তাই রাজা বাহাদুরের হুকুমে ওখানে একটা পুকুর কাটা হয়েছে।

ম্যানেজারবাবু একটু থেমে একটু হেসে বলেন, এই সেই পুকুর কাটার খরচ।

—ও!

অন্য একটা কাগজ সই করতে করতেই রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন, পুকুরে ভাল জল পাওয়া যাচ্ছে?

—হ্যাঁ, মা জননী, খুব ভাল জল। ঐ জল খেয়েই তো অতগুলো প্রজা বেঁচে আছে।

আবার একটা কাগজ সই করতে করতেই রাজকুমারী প্রশ্ন করেন, শ্রীপুর তো নহাটা তালুকেই, তাই না?

—হ্যাঁ, মা জননী।

নতুন একটা কাগজ সই করাবার জন্য রাজকুমারীর সামনে ধরেই ম্যানেজারবাবু বলেন, এই নহাটা থেকে ঠিক সাত ক্রোশ উত্তরে শ্রীপুর। ওখানকার প্রজারা বড্ড ভাল।

কাগজপত্র সই করতে করতেই রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন, আপনি শ্রীপুর গিয়েছেন?

—বহুবার।

ম্যানেজারবাবু না থেমেই বলেন, ঐ পুকুর কাটাবার সময়ই তো আমাকে তিন-চারবার যেতে হয়েছে।

বিন্দুমাত্র কোন প্রশ্ন না করে সব কাগজপত্র সই করে দেবার পর রাজকুমারী বললেন, সেরেস্তার সব কর্মচারীদের একে একে ডাক দিন। ওদের নাম-ধাম জেনে নিই।

—আমি এখুনি ওদের এনে হাজির করছি।

একটু পরেই ম্যানেজারবাবু ওদের এক একজনকে রাজকুমারীর সামনে হাজির করে পরিচয় করিয়ে দেন।

—মা জননী, ইনি গোবিন্দ বাড়ুজ্যে। রাজবাড়ির সবকিছু ইনিই দেখাশুনা করেন।...ইনি হৃদয় সরকার। ইনি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার সামলান।...ইনি হরিহর ভট্চাজ্ ; দেবোত্তর সম্পত্তি সামলান।

দিন সাতেক পরের কথা।

সাত সকালে সেরেস্তায় এসেই রাজকুমারী তাঁর এক খাস কর্মচারীকে বললেন,

গ্যারাজ থেকে দুটো গাড়ি নিয়ে আসতে বলো। দেরি হয় না যেন ; আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

গাড়ি আসার পর পরই রাজকুমারী একটা গাড়িতে বসে চাপা গলায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীপুর চেনো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখান থেকে রওনা হবার পর পথে কোথাও থামতে পারবে না ; থামবে একেবারে শ্রীপুরে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দাও, ঠিক পিছনে থাকতে কিন্তু ওকে বলো না আমি কোথায় যাচ্ছি।

এবার রাজকুমারী দারোয়ানকে বললেন, ম্যানেজারবাবু, হৃদয় সরকার আর অমূল্যকে ডাক দাও।

ওরা তিনজনে হাজির হতেই রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে বললেন, ম্যানেজারবাবু আমার গাড়িতে উঠুন আর আপনারা দু'জনে পিছনের গাড়িতে বসুন।

ওরা গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট করলো। গাড়ির সামনের সীটে বসে ম্যানেজারবাবু অবাক বিস্ময়ে কত কি ভাবেন। জানতে ইচ্ছা করে কোথায় যাচ্ছেন কিন্তু রাজকুমারীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলায় না। রাজকুমারীও একটি কথা বলেন না। উদাসীন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নহাটা পার হতেই একটা অজানা আশঙ্কায় মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেও ম্যানেজারবাবু কিছু বলতে পারেন না।

রাজবাড়ির দু'টো মোটর গাড়ি শ্রীপুরে ঢুকতে না ঢুকতেই গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। নতুন রানী মা'কে প্রণাম করে। রাজকুমারী হাসি মুখে ওদের আশীর্বাদ করেই বলেন, আমি এসেছি তোমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা জানতে।

এক দল মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে বলে, নতুন রানী মা, আমরা জলের অভাবে মরে যাচ্ছি।

এক বৃদ্ধ বলল, আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে আর আমাদের কান্নাকাটি দেখে রাজা বাহাদুর পর্যন্ত বলেছিলেন, পুকুর কাটিয়ে দেবেন কিন্তু কিছুই তো হলো না।

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন, একটা পুকুর কাটতে কত খরচ হবে?

বৃদ্ধ গিয়াসুদ্দীন বলে, আমি আর হারান মণ্ডল রাজা বাহাদুরকে কথা দিয়েছিলাম, হাজার দেড়েক টাকার মধ্যেই আমরা কাজ শেষ করবো।

—কার জমিতে পুকুর কাটবে?

—আপনাদের খাস জমিতেই পুকুর হোক।

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

মুহূর্তের জন্য থেমে রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন, পুকুর কাটতে কত দিন সময় লাগবে?

—আপনি দয়া করে হুকুম দিলে সারা গ্রামের লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে মাস খানেকের মধ্যেই কাজ তুলে দেবে।

রাজকুমারী ব্যাগ থেকে একশ টাকার পনের খানা নোট বের করে গিয়াসুদ্দীনের হাতে দিয়ে বললেন, এই দেড় হাজার টাকা রইলো। কাল থেকেই কাজ শুরু করো। যদি এই টাকায় না কুলায়, তাহলে আমাকে জানিও।

হারাণ মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, নতুন রানী মা কি!

সারা গ্রামের মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করে, জয়!

—নতুন রানী মা কি!

—জয়!

—নতুন রানী মা কি!

—জয়।

রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে বলেন, তোমরা সবাই মনে রেখো, তোমরা আমার প্রজা, আমার কর্মচারীদের প্রজা না। তোমাদের সুখ-দুঃখের কথা সরাসরি আমাকে বলবে। আমি সাধ্যমত তোমাদের দুঃখ-কষ্ট নিশ্চয়ই দূর করবো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার কর্মচারীরা শুধু আমার হুকুম তামিল করবে কিন্তু তোমাদের কোন হুকুম করবার অধিকার তাদের নেই। যদি আমার কোন কর্মচারী তোমাদের উপর কোনরকম জুলুম বা অত্যাচার করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন খবর পাই।

বৃদ্ধ গিয়াসুদ্দীন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, নতুন রানী মা, আমাদের মত গরীব-দুঃখী কি যখন তখন আপনার দর্শন পেতে পারে?

রাজকুমারী একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা পাবে।

এবার উনি ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, ম্যানেজারবাবু, এই শ্রীপুরের প্রজাদের আপনি কিছু বলবেন?

ম্যানেজারবাবু অধোবদনে বলেন, মা জননী, আমি এদের উপর যে অন্যায় অবিচার করেছি, তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর জীবনে এই ধরণের অন্যায় করবো না।

ম্যানেজারবাবুর কথা শুনে প্রজারা না, হৃদয় আর অমূল্যও অবাক হয়ে যায়।

রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে বললেন, গাড়িতে উঠুন। সেরেস্তায় গিয়ে কথা হবে।

সেরেস্তায় ফিরে এসে সব কর্মচারীদের সামনেই রাজকুমারী ম্যানেজারবাবুকে বললেন, বছরে কত টাকা চুরি করেন?

যাকে সবাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মত ভয় পায়, সেই ম্যানেজার ঠক ঠক কাঁপতে থাকেন। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না।

—ম্যানেজারবাবু, রাজবাড়িতে সবশুদ্ধু বাহাত্তর জন ঝি-চাকর-দারোয়ান-কোচোয়ান-ড্রাইভার আছে কিন্তু আপনার খাতায় লেখা আছে, একশ আঠারো জন কর্মচারীর নাম। আপনি আর গোবিন্দ বাড়ুজ্যে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই গোবিন্দ বাড়ুজ্যে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, বিশ্বাস করুন মা, আমি শুধু ম্যানেজারবাবুর হুকুম তামিল করি।

—আপনার ভাগে কত জোটে?

—কোন মাসে একশ', কোন মাসে দেড়শ'-দু'শ।

রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে বললেন, ম্যানেজারবাবু, দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বছরে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আয় হলেও খাতায় জমা হয় কুড়ি-বাইশ হাজার। তাছাড়া জন্মাষ্টমী-ঝুলন-দোলযাত্রার পূজার সময় গরীব-বড়লোক প্রজারা রাধাকৃষ্ণকে যে সোনা-রূপোর গহণা দেয়, তাও আপনি আর হরিহর ভট্চাজ এত বছর ধরে চুরি করে চলেছেন।...

হরিহর সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জোড় করে প্রায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, না, না, মা জননী, আমি কোন গহণা নিইনি ; তবে প্রণামীর পুরো টাকাটাই আমি নিই।

—প্রণামীর টাকা কি আপনার প্রাপ্য?

—না, মা জননী, আমার প্রাপ্য না ; শুধু দক্ষিণার টাকাটা আমার প্রাপ্য।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, ম্যানেজারবাবু থেকে শুরু করে সব কর্মচারীরাই চুরি করে বলে আমিও প্রণামীর টাকা চুরি করেছি।

—প্রত্যেক উৎসবে নাটোরের মহারানী যে পূজা দেন, তার সঙ্গে যে দশটা করে গিনি পাঠান, সেগুলো...

—বিশ্বাস করুন মা জননী, আমি মাত্র একটা করে গিনি পাই। বাকি সব ম্যানেজারবাবু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাজকুমারী হাসতে হাসতেই বলেন, আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, বছর তিনেক আগে কলকাতায় রায় বাহাদুর নৃপতি মুখার্জীর যে দুটো জমি কেনার জন্য বাবা আপনাকে ছাপান্ন হাজার টাকা দিয়েছিলেন সে দুটো জমিই

কি নিজের নামে রেজেষ্ট্রী করেছেন?

ম্যানেজারবাবু মুখ নীচু করে বলেন, হ্যাঁ, মা জননী।

এবার রাজকুমারী গম্ভীর হয়ে কর্মচারীদের বললেন, আমার আর বক বক করতে ভাল লাগছে না। তবে আপনাদের বলে দিচ্ছি, আপনাদের প্রত্যেকের চুরির খবর জেনে গেছি। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনারা চুরি করা টাকা আর গহণা ফেরত না দেন তাহলে আমি প্রত্যেকের নামে ফৌজদারী মামলা করে হাজত বাসের ব্যবস্থা করবো।

উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, মাইনের টাকায় যদি আপনাদের সংসার চালাতে কষ্ট হয়, তাহলে আমাকে বলবেন। আমি মাইনে বাড়িয়ে দেব কিন্তু গরুর দুধ থেকে রাধাকৃষ্ণের গহণা পর্যন্ত আপনারা চুরি করবেন, তা আমি কখনই বরদাস্ত করবো না।

পরবর্তী ছ'দিন রাজকুমারী আর সেরেস্তার দিকে পা বাড়ালেন না ; দুটি তালুকের প্রায় তিরিশ-পয়ত্রিশটা গ্রাম ঘুরে এলেন।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে রাজকুমারী সেরেস্তায় যেতেই ভেড়ার পালের মত কর্মচারীরা নিঃশব্দে টাকা-কড়ি-গহণা রেখে যান। হিসেব-নিকেশ গোনাগুন্তি করে দেখা গেল, কর্মচারীরা প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা, সাড়ে পাঁচ সের রূপা আর বারো শ' ভরি সোনার গহণা ফেরত দিয়েছেন।

ঐ টাকা কড়ি সোনা-রূপা দিয়েই রাজকুমারী কুসুমকুমারী জমিদারীর তিনটি অঞ্চলে দুটি ছেলেদের আর একটি মেয়েদের স্কুল তৈরি করলেন।

তবে এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর পদ্মা-গঙ্গা-মেঘনা-ধলেশ্বরী দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। ব্যারিষ্টার যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর সঙ্গে কুসুমকুমারীর বিয়ে হয়েছে। ছ'টি সন্তানের জননী হয়েছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী দেখাশুনো করেছেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। প্রজারা প্রাণ দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে।

তারপর রাজকুমারী কুসুমকুমারী জীবনে আরো কত কি ঘটে গেছে। অনেক দিন আগেই মা-বাবাকে হারিয়েছিলেন কিন্তু ছেলেমেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামীকে হারালেন পদ্মার নৌকাডুবিতে। সেই কালো রাত্রির স্মৃতি উনি কোনদিন ভুলতে পারেননি ; ভুলতে পারেন নি প্রজাদের কথাও। খবর পাবার পর পরই হাজার খানেক মেয়ে-পুরুষ প্রজা রাজপ্রাসাদের সামনে এসে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এই সর্বনাশের বছর খানেকের মধ্যেই দেশ দু টুকরো হলো।

তারপর একদিন সরকারী হুকুমে জমিদারীও চলে গেল। রাজকুমারী কুসুমকুমারী চিরদিনের মত রাজশাহী ছেড়ে চলে এলেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে।

তবে হ্যাঁ, কলকাতাতেও কুসুমকুমারী রাজকুমারীই রইলেন। থিয়েটার রোড-লাউডন ষ্ট্রীট-আমীর আলী এভিনু—ল্যান্সডাউন-রাজা বসন্ত রায় রোড-রাসবিহারী-সাদার্ন এভিন্যুতে প্রায় রাজপ্রসাদের মত বিশাল সাতটি বাড়ি, যশোর রোডের উপর বিশ বিঘের বাগান বাড়ি, হাইকোর্ট পাড়ার পাঁচতলা বাড়ির ছ'আনা অংশ, ঠাকুরপুকুরে দশ-বারো বিঘে ধানের জমি ছাড়াও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে মোটামুটি লাখ পঁচিশেক টাকা ও মন দশেক রূপার বাসনকোসন, অন্তত দেড়-দু'হাজার ভরি সোনার গহণা, দুটো ফোর্ড আর একটা অষ্টিন গাড়ি যার থাকে, তিনি নিশ্চয়ই রাজকুমারী।

কুসুমকুমারী দেশত্যাগ করে এসেও রাজশাহীর প্রজাদের ভুলতে পারলেন না। রাজশাহী ও বিশেষ করে তাঁর শুধু প্রজাদের ছেলেদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য প্রথমে রাসবিহারীতে ও পরে সাদার্ন এভিন্যুর বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'চার বছর পর রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে চালু করলেন মেয়েদের হস্টেল। নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়-দীক্ষায় উপযুক্ত করতেও বিন্দুমাত্র কার্পন্য করলেন না। বড় ছেলে সৌরেন্দ্রকে বিলেতে পাঠালেন ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য। পাঁচ-ছ'বার ফেল করার পর কোনমতে পাশ করে দেশে ফেরার পর তিনি পাটনা হাইকোর্টের এক ব্যারিষ্টারের এক মাত্র মেয়েকে বিয়ে করে পাটনা হাইকোর্টেই প্রাকটিশ শুরু করলেন। মেজ ছেলে নৃপেন্দ্র বিলেত না গেলেও এম. এস-সি পাশ করে দু'জন বন্ধুকে পার্টনার করে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী খুললেন। আর ছোট ছেলে মানবেন্দ্র বার তিনেক বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করার পর শুধু গানবাজনা নিয়েই মেতে রইলেন। তিনটি মেয়েকে গ্রাজুয়েট করার পরই কুসুমকুমারী তাদের বিয়ে দিলেন বনেদী বাড়ির সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রদের সঙ্গে। একটু দেরি করে হলেও নৃপেন্দ্র বিয়ে করেছিলেন এক বিখ্যাত সার্জেনের ডাক্তারী পাশ করা মেয়েকে। বিয়ে করলেন না শুধু গান পাগল মানবেন্দ্র।

রাজকুমারী পাঁচটি ছেলেমেয়ের বিয়েতেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তিন মেয়ে আর দুই পুত্রবধূকে একশ' ভরি করে গহণা দিয়েছেন। এছাড়া পাঁচজনকেই নগদ এক লাখ করে টাকা দিয়েছেন। ছোট ছেলেকে গান বাজনা শেখার জন্য যথেষ্ট খরচ করলেও অন্য পাঁচজনের মত তাকে আর কিছু দেননি। শ্বশুরের তৈরি বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের দোতলা বাড়িটিতে বড় দুই ছেলে থাকলেও ছোট ছেলেকে কুসুমকুমারী নিজের ল্যান্সডাউনের বাড়িতেই রেখেছিলেন।

বিদ্যা-বুদ্ধি-ব্যক্তিত্বের জন্য ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীরাও কুসুমকুমারীকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁকে কোনকিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না। কদাচিৎ কখনও নাতিনাতনীরা ঠাট্টা করে কিছু বললে বা জিজ্ঞাসা করলেই উনি হাসতে হাসতে বলতেন, আমার বাপের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? আমি কি তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তির ব্যাপারে কখনও কিছু বলি বা জিজ্ঞাসা করি?

তবে সবাই চাতক পাখীর মত হা করে বসেছিলেন, বুড়ীর মৃত্যুর পর টাকা কড়ি বিষয়-সম্পত্তির ভাগ পাবার জন্য। মানবেন্দ্র এসব ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও অন্য সবার স্থির বিশ্বাস ছিল, কলকাতা ও তার আশেপাশের জমিজমা আর সাত খানা বাড়ি বিক্রি করেই ট্যাক্সের ঝামেলা মিটিয়েও প্রত্যেকের ভাগে মোটামুটি এক কোটি টাকা জুটবেই। এর উপর সোনা-রূপা, বাসনকোসন, লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র-পেন্টিং ছাড়াও ব্যাঙ্কে বিশ-পঁচিশ লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই আছে।

যিনি এই বিশাল সম্পত্তি রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন, তাঁর শ্রাদ্ধে যে ছেলেমেয়েরা দশ হাতে খরচ করবেন, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে কুসুমকুমারী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান। মানবেন্দ্রর টেলিফোন পেয়েই রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের একদল সন্ন্যাসী আর ডাক্তার-নার্সরা ছুটে এসেছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলো পরের দিন দুপুরে কিন্তু মাঝ রাত্তিরের আগে মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। ছেলেমেয়েরা ওর মুখের কাছে কান পেতে রইল। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছেন।

মৃত্যুর দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কুসুমকুমারী একটু হেসে ইসারায় ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীদের কাছে ডাকলেন। আশীর্বাদ করলেন। তারপর কোনমতে বললেন, আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিময়কে খবর দিও। ওকে সব বলা আছে।

সৌরেন্দ্র আর স্বর্ণকুমারী এক সঙ্গে জানতে চান, জজ্‌দাদার কথা বলছো কি?

কুসুমকুমারী কোনমতে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

বোধহয় ছোট মেয়ে সুকুমারীই জিজ্ঞেস করল, উইল কি ওর কাছে আছে?

না, কুসুমকুমারী আর মাথাও নড়তে পারেন নি। একটি শব্দও বলতে পারেন নি। হাসি হাসি মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও হৃদপিণ্ডটা ওঠানামা করছিল কিন্তু রাত ৯ টা ১৮ মিনিটে তাও চিরদিনের মত থেমে গেল।

খবর পেয়েই ছুটে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন-বিচারপতি ভক্তিময় ঘোষ। কুসুমকুমারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মা, শুধু তোমার কৃপাতেই তোমার গরীব প্রজার এই ছেলে

বি.এ-এম.এ পাশ করে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত গেছে। শুধু তোমার আশীর্বাদেই আমার মত অপদার্থও হাইকোর্টের জজ্ হয়েছে। মা, তুমিই আমার মা সারদা, তুমিই আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

যাইহোক শ্মশানঘাটেই উনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন, মা'র লিখিত নির্দেশ মত নিয়মভঙ্গের পরদিন সকালে উইলের বৃত্তান্ত চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দেব।

ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী পুত্রবধূ-জামাইরা একটু বিচিত্র উত্তেজনায় ও আকাশচুম্বী প্রত্যাশা নিয়ে মাঝের ক'টা দিন কাটিয়ে দেবার পর শেষ পর্যন্ত সেদিন এসে হাজির হলো।

ঠিক সকাল ন'টায় বিচারপতি ভক্তিময় ঘোষ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আরো চারটে গাড়িতে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে হাজির হলেন। বাড়ির সবার সঙ্গে ভক্তিময় তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী মহারাজ, ষ্টেট ব্যাঙ্কের চীফ্ জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভেঙ্কটরমন, অ্যাসিসট্যান্স কমিশনার অব্ ইনকাম ট্যাক্স মিঃ সরকার আর ইনি ক্যালকাটা হাই কোর্ট বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ চ্যাটার্জী।

ব্রীফ কেস থেকে সীল করা মোটা একটা খাম বের করে মিঃ ভেঙ্কটরমন বললেন, রাজকুমারী কুসুমকুমারী দেবীর এই উইল আমাদের সেফ্ কাষ্টডিতে ছিল।

এবার উনি খামটা এগিয়ে ধরে বললেন, জাষ্টিস ঘোষ, আপনি, মিঃ সরকার আর মিঃ চ্যাটার্জী প্লীজ পরীক্ষা করে দেখুন, সীল ঠিক আছে কিনা।

ওরা প্রত্যেকে খামটা নেড়েচেড়ে দেখেশুনে পরীক্ষা করে বললেন, সীল ঠিকই আছে।

মিঃ ভেঙ্কটরমন বললেন, জাষ্টিস ঘোষ, প্লীজ খাম খুলে উইলটা পড়ে শুনিয়ে দিন।

বিচারপতি ভক্তিময় ঘোষ খাম খুলে আস্তে আস্তে উইল পড়তে শুরু করেন—আমি রাজকুমারী কুসুমকুমারী দেবী ৯২ বছর বয়সে সজ্ঞানে ও অত্যন্ত সচেতন হয়ে এই উইল করছি। স্বয়ং লর্ড কর্নওয়ালিশের কৃপায় আমার পূর্বপুরুষ জমিদারী লাভ করেন। রাজশাহী জেলার প্রায় অর্ধেক ছাড়াও উত্তর বঙ্গের আরো তিনটি জেলায় আমাদের বিশাল জমিদারী ছিল ও প্রজার সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে জমিদারী পরিচালনা ও প্রজাদের কল্যাণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরও আমরা সরকারকে ২৮ লাখ ৩৬ হাজার ৩২৬ টাকা

৯ আনা রাজস্ব দিয়েছি। তাই তো ইংরেজ সরকার আমার পূর্বপুরুষকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব রাজা রাঘবেন্দ্র যখন আমার হাতে জমিদারীর ভার অর্পণ করেন, তখন আমি বাইশ বছরের যুবতী। ঈশ্বর ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে শপথ করে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচার মত প্রজাপালন করেছি ও সাধ্যমত তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছি। আমি একথাও স্বীকার করতে বাধ্য, প্রজাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসায় আমি মুগ্ধ ও ধন্য হয়েছি এবং তাদেরই অনুগ্রহে আমি এখনও প্রচুর অর্থ, সোনারূপা ও বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিনী।

যাইহোক আমার শ্বশুরের তৈরী বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে যে দোতলা বাড়িতে আমার দুই ছেলে সৌরেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র থাকে, তা বিনা সর্তে তাদের দান করছি। ল্যান্সডাউন রোডের যে তিনতলা বাড়িতে আমি ও আমার ছোট ছেলে মানবেন্দ্র বসবাস করছি, তার সম্পূর্ণ মালিকানা আমার মৃত্যুর পর মানবেন্দ্রর হবে। আমার সাদার্ন এভিন্যুর তিন তলা বাড়িটির এক একটি তলার মালিক হবে আমার এক একটি মেয়ে এবং এই উইলের শেষে উল্লেখিত পাঁচজনের যে কোন তিনজনের তদারকীতে লটারী করে ঠিক হবে, কে কোন তলা পাবে। মেয়েরা যদি কোনদিন এই বাড়ি বিক্রি করতে চায়, তাহলে শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকেই তা বিক্রি করা যাবে এবং এই বাড়িটিকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার বা বিক্রি করার পূর্ণ অধিকার তাদের থাকবে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের হাই কোর্ট শাখায় আমার স্বামী যে টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, তা থেকে আমি এক কপর্দকও নিইনি। এই টাকা আমার ছ'সন্তান সমানভাবে পাবে।

আমার সন্তানরা আমার জমিদারী দেখেনি। তাদের কেউ কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমার প্রাণপ্রিয় প্রজাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় নি। সুতরাং প্রজাদের অনুগ্রহে আমি যে বিষয়-সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারিনী হয়েছি, তার উপর তাদের কোন দাবী থাকতে পারে না।

আমার বাকি সব স্থাপর-অস্থাবর সম্পতি আমার সন্তানতুল্য বিচারপতি শ্রীভক্তিময় ঘোষ, ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ও ষ্টেট ব্যাঙ্কের চীফ্ জেনারেল ম্যানেজারের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধির সামনে সুপ্রসিদ্ধ বাটলিবয় কোম্পানীর দ্বারা নীলাম করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেবেন।...

উইল পড়া শেষ হতেই শুধু মানবেন্দ্র ছাড়া অন্য সব ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী পুত্রবধূ-জামাইরা রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
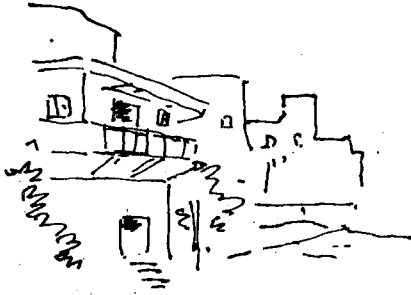
ভাড়াটে

মালা নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকেই বেশ সুর করেই সুবোধবাবুকে বলল, জ্যেঠু, বাবা ভাড়া দিতে বললেন।

সুবোধবাবু মুখে তুলে ওর দিকে তাকিয়ে কষ্ট করেও একটু হেসে বলেন, মা, তুমি বাবাকে বলো, আমি এখনও মাইনে পাইনি। আমি তো প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি। প্রত্যেক মাসে সাত তারিখে মাইনে হয় না।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, তবে দু'তিন দিনের মধ্যেই মাইনে হবে। আমি মাইনে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বাবাকে ভাড়ার টাকা দিয়ে দেব।

মালা যেমন নাচতে নাচতে এসেছিল, সেইরকমই নাচতে নাচতে চলে যায়।

খোকন সঙ্গে সঙ্গে ওর মাকে বলে, মেয়েটা এমন বিচ্ছিরি সুর করে ভাড়ার টাকার কথা বলে যে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কমলা দেবী একটু হেসে বলে, ও বাচ্চা মেয়ে! ওর কি দোষ?

উনি একটু থেমে বলেন, ওর বাবা ওকে যা বলতে বলেন, ও তাই বলে।

—কিন্তু অমন নাচতে নাচতে এসে অমন সুর করে কথা বলে কেন? কথাটা কি ভাল ভাবে বলা যায় না?

কমলা দেবী আবার হেসে বলেন, মালা কি আমাদের মত বড় হয়েছে যে আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করবে? ঐ বয়সী ছেলেমেয়েরা এই রকমই দৌড়ে দৌড়ে চলে।

বাগবাজারের এই বাড়িটা দীনেশবাবুর পৈতৃক সম্মতি। বাড়িটি দোতলা। একতলায় বড় বড় দুটি শোবার ঘর ছাড়াও মাঝারি সাইজের রান্নাঘর, ছোট্ট একটা

স্টোর আর বাথরুম-পায়খানা আছে। দোতলায় শুধু দুটি ঘর আর ছোট্ট একটা বাথরুম। তবে হ্যাঁ, এক ফালি সরু লম্বা বারান্দা আছে।

দীনেশবাবুর মা গত হয়েছেন মালা হবার বছর দেড়েক আগে আর বাবা বিরাশি বছর বয়সে গত হলেন বছর দুই আগে। ওরা মারা যাবার পর থেকে দোতলার ঘর দুটো ফাঁকাই পড়েছিল।

কলকাতার শহরে কেউই খালি ঘর ফেলে রাখতে চায় না। দীনেশবাবুও ভাবছিলেন, যদি দোতলাটা ভাড়া দিয়ে কিছু আয় বাড়ানো যায়, তাহলে ভালই হয়। কথাটা স্ত্রীকে বলতেই ছায়া দেবী বলেছেন, যারা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে, তারা উপরে থাকবে কি করে? উপরে কি রান্নাঘর আছে?

—তা নেই কিন্তু বারান্দা তো আছে।

—থাকবে না কেন কিন্তু ঐ এক ফালি সরু বারান্দায় বসে যে রান্না-বান্না করবে, সে রোদ্দুর বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবে কি করে?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যারা সংসারধর্ম করে, তারা কি মেসে-হোটেলে খেতে যাবে?

দীনেশবাবু তর্ক করেননি। তিনি নিজেও এই সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন ; তবু এই আকালের বাজারে দুটো ঘর খালি ফেলে রাখতেও মন চায়নি। একে-ওকে বলেছেন। চার-পাঁচজন ভদ্রলোক বাড়ি দেখতেও এসেছেন কিন্তু রান্নাঘর নেই বলে সবাই পিছিয়ে গেছেন।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত বছর খানেক পর সুবোধবাবু ভাড়া নিতে রাজি হলেন। উনি স্ত্রীকে নিয়েই বাড়ি দেখতে এসেছিলেন।

সুবোধবাবু ওর স্ত্রীকে বললেন, বারান্দায় রান্না করতে তোমার অসুবিধে হবে না?

কমলা দেবী বললেন, অসুবিধে তো হবেই। তবে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা ছোট-খাটো ত্রিপল ঝুলিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, তা দেব কিন্তু...

—ভাড়া বাড়িতে তো সব সুবিধে পাওয়া যায় না। এখানে থাকলে তুমি অন্তত ডেলি প্যাসেঞ্জারী করার ঝামেলা থেকে বাঁচবে।

—হ্যাঁ, তা পাবো।

—ঘর দুটো তো বড় আছে। বারান্দায় কোনমতে রান্না সেরে ঘরের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

—বাথরুমও বেশ ছোট।

—বললাম তো, ভাড়া বাড়িতে সব সুবিধে পাওয়া সম্ভব না। এর মধ্যেই সব মানিয়ে নিতে হবে।

ওরা দোতলা থেকে নীচে নেমে আসতেই দীনেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, দাদা, কেমন লাগলো?

—রান্নাঘর নেই, বাথরুমও বেশ ছোট বলে আমি বিশেষ উৎসাহী না হলেও আমার স্ত্রী বললেন, অত ভাবনা-চিন্তা না করে এখানেই চলে আসতে।

দীনেশবাবু কমলা দেবীকে বলেন, বৌদি, বারান্দায় রান্না করতে আপনার একটু কষ্ট হবে ঠিকই কিন্তু ঘর দুটো তো বেশ বড় আছে।

—হ্যাঁ, ঘর দুটো বেশ বড়।

উনি একটু থেমে বলেন, বারান্দায় রান্না করে একটা ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

ছায়া দেবী ওদের চা-বিস্কুট দিয়ে কমলা দেবীকে বলেন, আপনাদের মত আমাদেরও ছোট্ট সংসার। বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে আপনি না হয় দু'একদিন আমার রান্নাঘরই ব্যবহার করবেন।

শুনে উনি খুশি হন।

দীনেশবাবু বলেন, একই ছাদের তলায় দুটো ফ্যামিলীকে থাকতে হলে তো মিলে মিশে থাকতেই হবে।

সুবোধবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে তো থাকতেই হবে।

চা-টা খাওয়া শেষ হতেই সুবোধবাবু টাকা কড়ি দিয়ে রসিদ পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, তবু দয়া করে মনে রাখবেন, আমি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি। আপনাদের ব্যাঙ্কের মত আমি পয়লা তারিখে মাইনে পাই না। মোটামুটি সাত দশ তারিখের মধ্যে মাইনে পাই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

দীনেশবাবু একটু হেসে বলেন, হাজার হোক আমার তো একটা চাকরি আছে। আপনি মাইনে পাবার পরই ভাড়া দেবেন। দু'চারদিন আগে-পরে হলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

তবু উনি প্রত্যেক মাসের সাত তারিখ সন্ধের পর অথবা আট তারিখ সকালেই মেয়েকে বলবেন, মালা, জ্যেঠুর কাছ থেকে ভাড়ার টাকাটা নিয়ে আয়তো।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গেই মালা লাফাতে লাফাতে দোতলায় এসে সুবোধবাবুকে বলবে, জ্যেঠু, বাবা বাড়ি-ভাড়ার টাকা চাইছেন।

কোন মাসে উনি সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেন, আবার কখনও কখনও দু' একদিন পরে দেন।

তবে এই বাড়িতে দু'চার মাস কাটাবার পরই সুবোধবাবু একদিন কথায় কথায় স্ত্রীকে বললেন, দীনেশবাবু আর তার স্ত্রী বেশ ভাল মানুষ। এরা আমাদের সঙ্গে ঠিক ভাড়াটের মত ব্যবহার করেন না!

কমলা বললেন, ঠাকুরপো একটু হিসেবী আছেন ঠিকই কিন্তু মানুষ হিসেবে বেশ ভাল। তবে ছায়ার কোন তুলনা হয় না। ও আমাকে ঠিক নিজের দিদির মতই মনে করে।

খোকন একটু হেসে বলে, কাকিমা আমাকে দারুণ ভালবাসেন। কাকুকেও ভাল লাগে কিন্তু মালা একটু বেশি আদুরে।

কমলা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ওর মত বয়সে তুইও যথেষ্ট আদুরে ছিলি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মালাকে আমার বেশ ভাল লাগে। ওর বড়মা ডাক শুনতে যে আমার কি ভাল লাগে, তা বলতে পারবো না।

—আর যখন সুর করে বলে, জ্যেঠু, ভাড়ার টাকা দিন বলে, তখন?

খোকন হাসতে হাসতেই বলে।

—ঠাকুরপো ভাড়ার টাকা চাইতে পাঠালে ও বেচারী কী করবে?

সুবোধবাবু বলেন, না, না, মালা এমন কিছু খারাপ ভাবে কথা বলে না।

ভাড়াটে হিসেবে সুবোধবাবুদের পেয়ে দীনেশবাবুরাও খুশি।

দিনে দিনে দু'টি পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা বেড়েই চলে।

সুবোধবাবু এক গ্রাস মুখে দিনেই অবাক হয়ে স্ত্রীকে বলেন, তুমি কি বাজার গিয়েছিলে?

—না তো।

—তাইলে মোচা কোথায় পেলে?

কমলা একটু হেসে বলেন, ছায়া দিয়েছে।

—বৌমা কি রেগুলারই কিছু না কিছু দিয়ে যান?

—ও জানে, তুমি নানা ধরণের শাঁক-সবজি তরকারী খেতে ভালবাসো ; তাই...

স্ত্রীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, আমি না হয় নিরামিষ খেতে ভালবাসি কিন্তু পরশু দিনই বৌমার পাঠানো চিকেন খেলাম।

—খোকন মাছের চাইতে মাংস খেতে ভালবাসে বলে ছায়া বেশ বড় এক বাটি মাংস দিয়েছিল কিন্তু ও কি অত খেতে পারে?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ওর থেকে তোমাকেও একটু দিয়েছি, আমিও একটু খেয়েছি।

সুবোধবাবু মোচার ঘণ্টো দিয়ে শেষ গ্রাস মুখে দিয়েই বলেন, মা মারা যাবার পরে এত ভাল মোচার ঘণ্টো খাইনি।

—সত্যি, ছায়ার হাতের নিরামিষ তরকারীর কোন তুলনা হয় না।

মিনিট পনের পরই নীচে থেকে দীনেশবাবুর চিৎকার শোনা যায়, বৌদি! বৌদি!

উর্নি থামতে না থামতেই মালা চিৎকার করে, বড়মা!

কমলা স্বামীর পাতে মাছের ঝোল দিয়েই নীচে যান।

উনি ঘরে পা দিতেই দীনেশবাবু এক গাল হাসি হেসে বলেন, বৌদি, আপনার হাত কী সোনা দিয়ে বাধানো?

কৌতুক মেশানো হাসি হেসে কমলা বলেন, কেন বলুন তো?

—বৌদি, যা দই-ইলিশ খেলাম, তা এ জীবনে ভুলব না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে হাসতে হাসতে বলেন, আপনার হাতের দই-ইলিশ খেয়েই বোধহয় দাদা আপনার প্রেমে পড়ে যান, তাই না?

ছায়া সঙ্গে সঙ্গে বলেন, দাদা তোমার মত পেটুক না।

—এ রকম দই-ইলিশ পেলে সবাই ডবল ভাত খাবে।

মালা বলে, বাবা, বড়মার হাতের পায়েস খেতেও দারুণ ভাল লাগে।

—ইস! আর মনে করিয়ে দিস না! পায়েসের কথা মনে পড়লেই আমার জিভে জল এসে যায়।

কমলা একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, ঠাকুরপো, আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো?

—রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!

তবে জ্যেঠু, বড়মা আর খোকনদাকে পেয়ে সব চাইতে খুশি হয়েছে মালা। অঙ্ক না মিললেই ও দৌড়ে চলে যায় জ্যেঠুর কাছে। উনি অঙ্কটা বুঝিয়ে দিলেই ও এক গাল হাসি হেসে বলে, জ্যেঠু, আপনি আমাদের অঙ্কের টিচার হলে খুব ভাল হতো।

খোকন পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠলেই মালা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েই বলবে, খোকনদা, এসো একটু লুডো খেলি।

—না, না, আমি লুডো খেলব না।

—কেন? তুমি তো এখনই খেতে বসছো না।

—লুডো খেলতে আমার ভাল লাগে না।

খোকন একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, আমি কি তোর মত বাচ্চা যে লুডো

খেলব।

—ইস! তুমি যেন কত বড়!

মালা এক নিঃশ্বাসে বলে, বড়মা যদি আমার সঙ্গে লুডো খেলতে পারে, তাহলে তুমি কেন পারবে না? তুমি কি বড়মার চাইতেও বড়?

খোকন কিছু বলার আগেই মালা ওর দু'হাত ধরে টানতে টানতে বলে, প্লীজ এসো না।

খোকন আর তর্ক-বিতর্ক না করে ওর সঙ্গে লুডো খেলতে বসে। মুখে যাই বলুক না কেন, লুডো খেলে খোকনও বেশ আনন্দ পায়। তারপর মালা যদি হেরে যায়, তাহলে খোকন হাসতে হাসতে ওর দু'কান ধরে বলে, দেখলি তো, আমার সঙ্গে লুডো খেলার মজা!

—ঠিক আছে। কাল তোমাকে ঠিক হারিয়ে দেব।

এইভাবেই দিনগুলো বেশ কেটে যায়। তবে হ্যাঁ, সাত তারিখ সন্ধের পর মালা ঠিক আগের মতই লাফাতে লাফাতে এসে বলে, জ্যেঠু, বাবা ভাড়া চাইছেন।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে খোকনের মন-মেজাজ বিগড়ে যায়।

দেখতে দেখতে বেশ ক'টা বছর কেটে গেল। খোকন সেকেন্ডারীর মত হায়ার সেকেন্ডারীতেও ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সারা বাড়িতেও। দীনেশবাবু একটা সুন্দর টাইটান রিষ্টওয়াচ ওর হাতে দিয়ে বললেন, খোকন, আজ ব্যাঙ্কের সবাইকে তোমার কথা বলেছি। তোমার জন্য আমার প্রেষ্টিজও বেড়ে গেলে।

খোকন ওকে প্রণাম করে বলে, কাকু, এত দামী ঘড়ি কেন কিনলেন? অযথা এতগুলো টাকা...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দীনেশবাবু একটু হেসে বলেন, খোকন, আমি জানি, তোমার কাকিমা থেকে শুরু করে আমাদের ব্যাঙ্কের লোকজন পর্যন্ত আমাকে কৃপণ ভাবে কিন্তু তোমাকে এর চাইতে কম দামের ঘড়ি দিলে তো আমি শান্তি পেতাম না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বুঝলে খোকন, আমার মত কেপ্পন লোকও কখনও কখনও দু'হাতে টাকা খরচ না করে থাকতে পারে না।

দীনেশবাবু কখনই উপরে আসেন না কিন্তু সেদিন উপরে এসে খোকনকে ঘড়ি দেবার পর সুবোধবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, কাল তো রবিবার। কাল দুপুরে আমরা সবাই এক সঙ্গে দুটো ডাল-ভাত খাবো।

সুবোধবাবু একটু হেসে বলেন, আমরা তো ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করিনি। খোকন ভালভাবে পাশ করেছে ; ওকেই খাওয়াবেন।

দীনেশ মুখ ঘুরিয়ে বলেন, বৌদি, কাল আপনি যদি রান্না করেছেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে। আপনি আর আমাকে ঠাকুরপো বলে ডাকতে পারবেন না।

কমলা একটু হেসে বলেন, আপনিও আড়ি করতে পারবেন না, আমিও ঠাকুরপো না ডেকে পারবো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা খাবো।

পরের দিন দুপুরে ডাল-তরকারী দিয়ে খাওয়া শেষ হতেই পাতে চিংড়ি মাছ পড়তেই সুবোধবাবু প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, বৌমা, এ তো হাতির সাইজের চিংড়ি!

দীনেশবাবু খেতে খেতেই গম্ভীর হয়ে বললেন, ছেলে ফার্ষ্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ কলে এই সাইজেরই চিংড়ি খেতে হয়।

—কিন্তু...

ছায়া বললেন, দাদা, আজ আর কিন্তু কিন্তু করবেন না। আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।

খোকন বলল, কাকিমা, আমি হাফ্ এ বেলায় খাই, বাকি হাফ্ রাত্রে...

মালা হাসতে হাসতে বলে, তোমার রাত্রের মাছও মা তুলে রেখেছে।

সেদিন সন্ধের পর মালা খোকনকে বলল, তুমি ফার্ষ্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে আমাকে যে কি বিপদে ফেললে, তা ভাবতে পারবে না।

খোকন অবাক হয়ে বলে, আমি আবার তোকে কি বিপদে ফেললাম?

—ফেললে না? এখন আমি সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করলেও তো মা-বাবার কাছে হাজারটা কথা শুনতে হবে।

খোকন একটু হেসে বলে, একটু ভাল ভাবে পড়াশুনা কলে তুইও ফার্ষ্ট ডিফিশনে পাশ করবি।

—আমি কি তোমার মত ভাল ছেলে যে চেষ্টা করলেই ফার্ষ্ট ডিভিশানে পাশ করবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক পারবি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি তোকে হেলপ্ করবো।

—ঠিক করবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, করবো কিন্তু তোকে খাটতে হবে।

—আমি কি বলেছি খাটবো না?

খোকন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মালাও

ক্লাশ টেন'এ ওঠে। খোকন নিজের পড়াশুনার মাঝেই ওকে পড়ায়, লেখায়, নোটস্ দেয়।

হঠাৎ মালাকে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখেই খোকন জিজ্ঞেস করে, হাসছিস কেন?

—তোমার মুখে কচি কচি দাঁড়ি-গোঁফ গজিয়েছে বলে বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে।

—আমি কি তোর মত মেয়ে যে দাঁড়ি-গোঁফ হবে না?

—আমি কি তাই বলেছি?

মালা মুহূর্তের জন্য থেমে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে, বললাম তো দেখতে খুব ভাল লাগছে।

—আমার রূপ চর্চা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি লেখাটা শেষ কর।

সাত তারিখ সন্ধেবেলায় মালা যথারীতি এসে হাজির হয় সুবোধবাবুর সামনে। বলে, জ্যেঠু, বাবা বললেন, আজ কি ভাড়া দেবেন?

মালা ভাড়া নিয়ে চলে যেতেই খোকন হাসতে বসতে ওর মাকে বলে, কাকু যেমন আগে বাড়িওয়ালা, পরে আর সবকিছু; সেইরকম মালাও আগে বাড়িওয়ালার মেয়ে, তারপর...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কমলা বেশ বিরক্ত হয়েই বলেন, আচ্ছা খোকন, মেয়েটা ভাড়া চাইতে এলেই তুই এত বিরক্ত বোধ করিস কেন বলতো? তোর কাকু ওকে বলেন বলেই ও আসে। তাছাড়া ভাড়া চাওয়া কি অন্যায়?

—না, না, তা না কিন্তু...

উনি ওর কথা কানে না তুলেই বলেন, আমরাও তো বিনা ভাড়ায় থাকতে আসি নি। আমাদেরও কর্তব্য ভাড়া দেওয়া।

দিন এগিয়ে চলে, মাসে ঘুরে যায়। দেখতে দেখতে আরো একটা বছর শেষ হয়। শতকরা তেষট্টি নম্বর পেয়ে মালা ফার্ষ্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করে।

ওর বাবা-মা দু'জনেই বললেন, স্রেফ খোকনের জন্য তুই ফার্ষ্ট ডিভিশন পেয়েছিস।

—আমি কি বলেছি খোকনদা আমাকে হেলপ্ করেনি?

সুবোধবাবু বললেন, খোকন যত সাহায্যই করুক, মালা নিজে যদি ভাল না হতো, তাহলে এই রেজাল্ট করতে পারতো না।

সন্ধের পর খোকন বাড়ি ফিরতেই মালা ওর ঘরে গিয়ে ওকে প্রণাম করে। খোকন একটু হেসে বলে, যাক, গুরু বলে স্বীকার করলি।

দু'দিন পর কমলা ওকে একটা খুব সুন্দর তাঁতের শাড়ি দেন। ওদের সবাইকে একদিন খাওয়ালেনও।

পরের দিন ঐ শাড়িটা পরে মালা জ্যেঠু আর বড়মাকে প্রণাম করে খোকনের ঘরে যায়। খোকন কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলে, মালা, তোকে দারুণ সুন্দর লাগছে। তুই সত্যি বেশ সুন্দরী!

—থাক, থাক, আর ন্যাকামী করতে হবে না।

ও না থেমেই বলে, তোমার কাছে আমি তো কিছুই না!

সময় তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে। খোকন বি. এ. পরীক্ষা দেয়। মালার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষাও শেষ হয়।

সুবোধবাবু ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যারে খোকন, এবার তো এম. এ. পড়বি?

—না।

—এম.এ. পড়বি না কেন?

—অর্ডিনারী এম. এ. পাশ করে তো কোন লাভ নেই। যদি রিসার্চ না করি, তাহলে শুধু শুধু এম. এ. পড়ে দুটো বছর নষ্ট করি কেন?

—তাহলে কী করবি?

—চাকরির জন্য দু' তিনটে পরীক্ষা দেব।

—কোন চাকরির জন্য পরীক্ষা দেবার কথা ভেবেছিস?

সুবোধবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, আই-এ-এস দিবি?

খোকন একটু হেসে বলে, না, না, অত বড় স্বপ্ন আমি দেখি না।

ও একটু থেমে বলে, ভেবেছি ডবলিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় বসবো।

—দীনেশবাবু বলছিলেন, ব্যাঙ্কের অফিসারের পরীক্ষা দিলে তুই ঠিক পাশ করবি।

—হাজার হাজার ভাল ভাল ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবে। ভ্যাকান্সী তো লিমিটেড। আগে থেকে কি বলা যায়, কে পাশ করবে বা ফেল করবে?

—তা ঠিক কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

সুবোধবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, আমার মনে হয়, তুই এম. এ. পড়তে পড়তেই এইসব পরীক্ষা দিতে পারবি। তুই এখনই চাকরি না পেলেও আমি ঠিকই সংসার চালিয়ে যাবো।

—তুমি যে কি সুখে চাকরি করছো, তা কি আমি জানি না?

খোকন একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, সপ্তাহে ছ'দিন ন'টা থেকে সাড়ে ছ'টা-সাতটা পর্যন্ত পশুর মত খাটিয়ে নিয়ে তোমার মালিক তোমাকে কি দিচ্ছেন, তা

কি আমি জানি না?

উনি একটু হেসে বলেন, সব প্রাইভেট ফার্মেই এইরকম পরিশ্রম করতে হয়।

—হ্যাঁ, করতে হয় বৈকি কিন্তু যাদের উপায় নেই, তারাই এই ধরনের প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে।

—সে যাইহোক, আরো দু'চার বছর চাকরি করতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। তুই এম.এ.পড়।

খোকন একটু হেসে বলে, তুমি যে ভাই-বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে-থা দিয়েছ, তারা তোমাকে ঠকিয়েছে, অপমান করেছে, তোমার অফিস তোমাকে ঠকাচ্ছে। তুমি নির্বিবাদে সব সহ্য করেছ ও করেছো। সম্ভব হলে আমি কাল থেকেই তোমার অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিতাম।

সুবোধবাবু ওর কথা শুনে হাসেন।

কমলা এতক্ষণ চুপ করে সব শোনার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, হাসছ কী? খোকন ঠিকই বলেছে।

এবার উনি ছেলেকে বলেন, হ্যাঁ, তুই এবার চাকরির চেষ্টা কর। তোকে আর এম.এ. পড়তে হবে না।

খোকন কিছু বই পত্তর কিনে নানা পরীক্ষা দেবার তোড়জোড় শুরু করে। তারপর একদিন বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরোয়। হ্যাঁ, খোকন বেশ ভাল ভাবেই পাশ করে। ডবলিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় ফর্ম জমা দেবার দিন দশেকের মধ্যেই ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার হবার পরীক্ষার বিজ্ঞাপন বেরোয়। মাস খানেকের ব্যবধানে ও দুটো পরীক্ষাই দেয়। এরই মধ্যে মালা সেকেন্ড ডিভিশানে হায়ারসেকেন্ডারী পাশ করে মনীন্দ্র কলেজ ভর্তি হয়।

হঠাৎ একদিন খোকনের মনে হয়, মালা যেন কেমন বদলে গেছে। এখনও আসা-যাওয়া করে, কথাবার্তা বলে কিন্তু আগের মত সেই উচ্ছাসও নেই, আন্তরিকতাও নেই।

ও মনে মনেই কত কি ভাবে। হাজার হোক বাবা এখন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। অনেক টাকা মাইনে পান। তাছাড়া ব্যবসাদারদের অ্যাডভান্স বা লোন পাইয়ে দিয়ে হয়তো তাদের কাছ থেকেও বেশ কিছু পকেটে আসে। ও তাঁর একমাত্র মেয়ে। সুন্দরী শিক্ষিতাও। দু'দিন পর এই বাড়ির মালিকও তো হবে। সুতরাং একটু অহংকার হওয়া তো স্বাভাবিক। অখ্যাত প্রাইভেট ফার্মের নগণ্য কেরানীর ছেলের সঙ্গে বোধহয় মেলামেশা করতে ওর মর্যাদায় বাধে। তা না হলে ও এমনভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেবে কেন?

তাইতো খোকনও নিজেকে একটু গুটিয়ে নেয়। একটু দূরত্ব রেখে চলে।

ও একদিন কথায় কথায় মাকে বলে, মা, তুমি কি খেয়াল করেছ মালা বেশ বদলে গেছে?

—বদলে গেছে মানে?

—বোধহয় একটু অহংকার হয়েছে।

—না, না ; ও তো ঠিক সেই আগের মতই আছে।

খোকন একটু হেসে বলে, হাজার হোক কাকু ম্যানেজার হয়েছেন ; প্রচুর মাইনে পান। কলকাতা শহরে নিজেদের দোতলা বাড়ি। আগে না বুঝলেও এখন মালা বুঝে গেছে, সবই ও পাবে। সুতরাং অহংকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

—হতে পারে কিন্তু আমি অন্তত বুঝতে পারিনি।

সেদিন বুধবার। খোকন কল্যানী গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে। সন্ধের মুখোমুখি বাড়ি ফিরতেই মালা একটু হেসে বলল, কনগ্রাচুলেশনস্!

—হঠাৎ?

খোকন একটু হেসে বলে, কি এমন জগৎ জয় করলাম যে কনগ্রাচুলেট করছো?

—উপরে গেলেই বুঝবে।

খোকন দোতলার বারান্দায় পা দিতেই কমলা এক গাল হাসি হেসে ওর হাতে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিটা পড়েই ও আনন্দে উত্তেজনায় মাকে কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করে, থ্রী চিয়ার্স ফর কমলা দেবী!

ওর চিৎকার শুনেই নীচে থেকে ছুটে আসেন ছায়া। উনি হাসতে হাসতে বলেন, দেখো খোকন, আমি বলে দিচ্ছি, তুমি ডবলিউ-বি-সি-এস পরীক্ষাও পাশ করবে।

—না, না, কাকিমা, অত সহজ না। ভাগ্যক্রমে ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার হবার পরীক্ষায় পাশ করেছি বলে সব পরীক্ষাতেই পাশ করবো, তার কোন মানে নেই।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, মা, চিঠিটা কখন এলো? বাবাকে বোধহয় খবরটা জানাতে পারো নি?

কমলা একটু হেসে বলেন, মালা তোর বাবাকেও ফোন করেছিল, কাকুকেও খবর দিয়েছে।

উনি না থেমেই বলেন, এখন তো তোর কাকুর ঘরেই ফোন আছে। তাইতো মালা চিঠিটা পড়েই ওদের দু'জনকে খবর দিয়ে দিল।

সেদিন সুবোধবাবু বাড়িতে এসেই বললেন, বুঝলি খোকন, মালার টেলিফোন পাবার পরই মিঃ ঢনঢনিয়াকে বলে দিলাম, স্যার, আমার ছেলে ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে। ও আর আমাকে চাকরি করতে দেবে না।

অনেক দিন পর দীনেশবাবু আবার দোতলায় এলেন। হাতের বিরাট হাঁড়িটা কমলা দেবীর হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে একশ'টা রাজভোগ আছে। খোকন খাবে পঁচিশটা, আপনার দু'জনে আর আমরা তিনজনে খাবো পঁচিশটা ; বাকি পঞ্চাশটা আশেপাশের বাড়িতে দিয়ে আসুন।

খোকন হাসতে হাসতে বলে, কাকু, আমি মোটে পঁচিশটা খাবো?

—ইয়েস ওনলি টোয়েন্টিফাইভ!

উনি সঙ্গে সঙ্গেই কমলা দেবীকে বলেন, বৌদি, আপনার ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে দিন আর আমার মেয়েটাকে আপনি নিয়ে নিন।

কমলা হাসতে হাসতে বলেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

তারপর?

খোকনের ট্রেনিং শুরু হয়, শেষ হয়।

নতুন কর্মজীবন শুরু করতে ও একদিন কামরূপ এক্সপ্রেসে চড়ে চলে যায় আলিপুর দুয়ার। ঢনঢনিয়ার হুকুম তামিল করার জন্য সুবোধবাবুকে আর উদয়-অস্ত ক্যানিং স্ট্রীটের ঐ জঘন্য পরিবেশে থাকতে হয় না।

প্রত্যেক রবিবার খোকন ফোন করে। রিসিভার তুলেই মালা চিৎকার করে, বড়মা! খোকনদার টেলিফোন।

তারপরই ও জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো খোকনদা?

—ভাল।

—মেসে খেয়ে কেউ ভাল থাকতে পারে?

—আমাদের মেসের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভাল।

—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করবো।

—সত্যি বলছি, ভালই আছি।

শুধু বাবা-মা না, কাকু-কাকিমার সঙ্গেও ও কথা বলে।

দীনেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে কত দিন ওখানে থাকতে হবে?

—ঠিক জানি না ; তবে শুনছি, বছর খানেকের মধ্যেই অন্য কোথাও যেতে হবে।

—হ্যাঁ, রুরাল-আর্বান-ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া না ঘুরিয়ে তোমাকে ঠিক পোস্টিং দেবে না।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

এদিকে ডবলিউ-বি-সি-এস এর রেজাল্ট বেরোয়। খোকন পাশ করলেও পজিশন অনেকের নীচে। সবাই বললেন, পশ্চিম বাংলায় সরকারী অফিসার হলে পদে পদে রাজনৈতিক ঝামেলা সহ্য করতে হবে। তাছাড়া স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসারদের

চাইতে মাইনে অনেক কম। তাইতো খোকন ইন্টারভিউ দিতেও গেল না।

দু'মাস পার হতে না হতেই আলিপুর দুয়ার থেকে খোকন বদলী হলো দুর্গাপুর। ওখানে প্রায় বছর খানেক থাকার পর ওকে যেতে হলো আরামবাগ। তারপর কালিম্পং।

ওখানে যাবার মাস তিনেক পরই খবর পেল মালা ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। খোকন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে বলে, মালা, কনগ্রাচুলেশনস্! সত্যি খবরটা শুনে খুব আনন্দ হলো।

—আমি জানতাম, তুমি খুশি হবে।

মালা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, হাজার হোক আমি তোমার একমাত্র ছাত্রী। ছাত্রী ভাল রেজাল্ট করলে মাষ্টার মশাইরা তো খুশি হবেনই।

—ইউ মাষ্ট গেট এ রিওয়ার্ড। এবার কলকাতায় গিয়ে তোমাকে একটা ভাল উপহার দেব।

বর্ষা শুরু হয়েছিল মাস খানেক আগেই কিন্তু এবার শুরু হলো এখানে-ওখানে ধ্বস নামা। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্কে এসেই খোকন খবর পেলো, শুধু শিলিগুড়ি যাবার রাস্তাই বন্ধ না, প্রচুর জল ঢুকে পড়ায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্পূর্ণ অচল। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, বৃষ্টি বন্ধ হবার পর অন্তত দশ-বারোদিন লাগবে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পুরোপুরি চালু করতে।

আঠারো দিন পর খোকন কলকাতায় টেলিফোন করতেই মালা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, খোকনদা, বাবা নেই।

খোকন চমকে উঠে বলে, সেকি?

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, কাকুর কি হয়েছিল? কবে...

—সেরিব্রাল অ্যাটাক।

মালা কাঁদতে কাঁদতেই বলে যায়, ব্যাঙ্কে কাজ করতে করতেই বাবা হঠাৎ পড়ে গিয়েই জ্ঞান হারান। ব্যাঙ্কের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ওকে নার্সিং হোমে নিয়ে যায় কিন্তু তার আগেই...

মালা কথাটা শেষ করতে পারে না।

খোকন আবার প্রশ্ন করে, কবে এই সর্বনাশ হলো?

—গত সোমবারের আগের সোমবার।

ও একটু থেমে বলে, হাজার চেষ্টা করেও তোমার লাইন পাওয়া গেল না। কমলা বললেন, যদি তুই দু'একদিনের জন্য আসতে পারিস, তাহলে খুব ভাল হয়।

—হ্যাঁ, মা, আমি নিশ্চয়ই আসার চেষ্টা করবো।

হ্যাঁ, পরের দিনই খোকন আসে। না এসে থাকতে পারে না।

কাকিমা আর মালা দু'জনেই ওকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদেন। খোকনও নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে।

দীনেশবাবুর শ্রাদ্ধ মিটে যাবার পরদিনই খোকন চলে যায়।

শূন্যতা থাকলেও চোখের জল শুকিয়ে যায়। মালা এম. এ. পড়তে শুরু করে। খোকনও এদিক-ওদিক ঘুরে বদলী হয় কলকাতার আলিপুর ব্রাঞ্চে।

ছায়া একদিন কথায় কথায় কমলাকে বললেন, জানো দিদি, মেয়েটাকে নিয়ে বড়ই ঝামেলায় পড়েছি।

—কি আবার ঝামেলায় পড়লি?

—ডাঃ নগেন চ্যাটার্জীর নাম শুনেছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব শুনেছি।

—উনি আমার বড়দার বন্ধু।

ছায়া একটু থেমে বলেন, ডাঃ চ্যাটার্জীর ছেলেও ডাক্তার। এম.ডি. পাশ করেছে। বড়দা ওর সঙ্গে মালার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি করার পর মেয়ে বেকে বসেছে।

—মালা কি বলে?

—ও সোজাসুজি বড়দাকে বলেছে, ওর বিয়ের ব্যাপারে কারুর মাথা ঘামাতে হবে না। ও পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করবে।

কমলা গম্ভীর হয়ে বলেন, মুস্কিল হচ্ছে, এখনকার ছেলেমেয়েরা মা-বাবার ইচ্ছে মত বিয়ে করে না। অনেকে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করতে চায় না। মালাও বোধহয় মনে মনে তাই ঠিক করেছে।

—কি জানি দিদি, ওর কি মতলব! উনি মারা যাবার পর মেয়েটা আরো বেশি জেদি হয়েছে কিন্তু অমন ভালো ছেলেটা হাত ছাড়া করা কি ঠিক হলো?

—সবই বুঝি কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কিছু করা সম্ভব না।

এদিকে সুবোধবাবুর প্রেশার বেড়ে যাওয়ায় উনি সোজাসুজি ছেলেকে বলেছেন, খোকন, আমার শরীরটা বিশেষ সুবিধের না। তাই আর দেরি না করে এবার তোমার জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করবো।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার এক পুরনো বন্ধু একটা ভাল মেয়ের খবর দিয়েছেন। মেয়েটির বাবা প্রফেসর বারীণ ঘোষ। মেয়েটি বি. এস. সি পাশ। শুনলাম,

দেখতেও ভাল, স্বভাব-চরিত্রও ভাল।

খোকন চুপ করে থাকে।

—আমি রবিবার মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছি। যদি আমার পছন্দ হয়, তাহলে তুমি আর তোমার মা গিয়ে দেখে ফাইন্যাল করে এসো।

রবিবার চারটে নাগাদ সুবোধবাবু বাড়ি থেকে বেরুবার পর পরই কমলা নীচে গেলেন ছায়ার সঙ্গে চা খেতে। খোকন নিজের ঘরে বসে কালিম্পং-এর এক বন্ধুকে চিঠি লিখছিল। হঠাৎ মালা এসে হাজির।

ও বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে অত্যন্ত গম্ভীর গম্ভীর হয়ে বলে, খোকনদা, কালই তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

খোকনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। ও অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

আহত বাঘিনীর মত ও খোকনের বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে আর আমাকে তাই সহ্য করতে হবে? এত বছর ধরে মেলামেশার পর তুমি অন্য মেয়েকে নিয়ে সুখী হবে?

খোকন আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে উঠলেও কোনমতে হাসি চেপে বলে, কিন্তু আমরা তো কায়স্থ।

—অত যদি জাত বিচার করো তাহলে বামুনের মেয়ের সঙ্গে মিশেছিলে কেন?

খোকন বারান্দার দিকে একটু এগিয়ে গিয়েই পাগলের মত চিৎকার করে, মা, শিগ্‌গির্ এসো। কাকিমা! তাড়াতাড়ি আসুন।

ওরা দু'জনেই পড়ি কি মরি করে ছুটে আসেন।

খোকন হাসতে হাসতে বলে, মা, ঠাকুমা যে হার দিয়ে তোমাকে বরণ করেছিলেন, সেই হার এক্ষুণি মালাকে পরিয়ে দাও। তা না হলে ও আমাকে খুন করবে।

কমলা দু'হাত দিয়ে মালাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, মা, তুই সত্যি সত্যি আমার কাছে থাকবি? এই কথাটা তুই আগে আমাকে বলিস কি কেন?

ছায়া আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি খুশিই হতেন।

খোকন হাসি চেপে বলে, মা, বাবার সল্টলেক যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটা মালার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

মালা মুখ ঘুরিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, দেবো না, দেবো না। দেবো না।

পলাতক

সারা ধুবড়ী শহরে এখন ঐ একটাই আলোচনা। ডি-সি সাহেবের অফিসের বাবুদের মধ্যে, জজ্ কোর্টের আশেপাশের জটলায়, বার লাইব্রেরীতে উকিলবাবুদের আড্ডায়, এস-পি অফিস থেকে প্রত্যেক থানার প্রত্যেক সিপাহীর মুখে ঐ একই আলোচনা।

আলোচনা হচ্ছে স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরীতে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার চন্দ সাহেবের ঘরে, হাটে-বাজারে কালীবাড়ির জমায়েতে। আলোচনা হচ্ছে ডি. কে. রোড-ছাতিয়ানতোলা-লোন অফিস লেন-এস. জি. রোড-ডাফরিন রোডের বাড়িতে বাড়িতে।

একে মার্চের শেষ ; তার উপর শনিবার। ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার-কর্মচারীদের নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। ঘোষদা প্রায় লাফ দিয়ে এ কাউন্টার থেকে সে কাউন্টারে গিয়ে চেক পাশ করছেন। তবু হঠাৎ রাজা মিত্তিরকে খানিকটা দূর দিয়ে যেতে দেখেই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে রাজা, নতুন ডি-সি সাহেব বলে আগে ছাতিয়ানতোলায় ঠিক তোদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন?

রাজা এক গাল হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ।

—তোর সঙ্গে আলাপ আছে?

ও হাসতে হাসতেই বলল, থাকবে না কেন? ঋষি তো কম দিন আমাদের পাশের বাড়িতে ছিল না!

—উনি এবার ডি-সি হয়ে আসার পর তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—গত রবিবার বাজার থেকে বাড়ি ফিরে শুনি ঋষি এসেছিল। দিদিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে একটু আগেই চলে গেছে।

—তার মানে তোদের সঙ্গে বেশ ভালই জানাশুনা আছে।

ঘোষদা কাউন্টারের দিকে পা বাড়িয়েই বলেন, পরে সব শুনব।

বিকাশ চন্দের ছাত্ররা সাত সকালে পড়তে এসে স্যার-এর বাড়ির সামনে ডি-সি সাহেবের গাড়ি আর পুলিশ দেখে অবাক হয়। ওরা গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াতেই দেখে, ডি-সি সাহেবকে বিদায় জানাবার জন্য বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছেন।

গাড়িতে ওঠার আগে ডি-সি সাহেব শেলী মাসীকে প্রণাম করে বলল, মাসীমা, মা এলেই আপনাকে খবর দেব।

পাশে দাঁড়ানো বৈশাখী-বর্ষা-চৈতালীর দিকে তাকিয়ে উনি একটু হেসে বললেন, আমি সার্কিট হাউস ছেড়ে বাংলোয় গেলে তোমরা এসো ব্যাডমিন্টন খেলতে।

বৈশাখী খুশির হাসি হেসে বলে, নিশ্চয়ই আসব।

ডি-সি সাহেব গাড়িতে উঠতেই সুফি মাসী বললেন, হ্যারে ঋষি, তোর বউ এলে একদিন নিয়ে আসিস।

—হ্যাঁ, মাসীমা, নিয়ে আসব।

টাউন হোটেলের সামনে দিয়ে মনোজ সরকারকে যেতে দেখেই হীরেন পাল ছুটে এসে ওর একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করে, মনোজদা, আমাদের নতুন ডি-সি সাহেব বুঝি আপনার ছাত্র ছিল?

—হ্যাঁ ছিল।

মনোজ সরকার মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি বছর পাঁচেক ওকে পড়িয়েছি।

হীরেন চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, শুনলাম, পরশু হঠাৎ আপনাকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে ডি-সি সাহেব গাড়ি থামিয়ে প্রণাম করেছেন আর...

মনোজ সরকার স্বভাব সুলভ ঔদাসীনের হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ করেছে কিন্তু তাতে হলো কী?

—না মানে, হাজার হোক উনি আই-এ-এস পাশ করে ডি-সি হয়েছেন তো!

এখন বাজারের টাউন স্টোর্সের সব খদ্দেরই কেনাকাটার পর একবার শিবাজী রায়ের টেবিলের সামনে এসেই একটু হেসে জিজ্ঞেস করছেন, শিবাজীদা, নতুন ডি-সি নাকি আপনাদের খুব চেনা?

শিবাজী রায় একটু হেসে বলেন, ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাছাড়া আমাদের দোকানের খদ্দেরও ছিলেন। তাই ঋষিও হরদম আসতো।

—এবার ডি-সি হয়ে আসার পর দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ ; রবিবার দুপুরে আমাদের বাড়িতে খেতে এসেছিল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ছেলেটা আই-এ-এস পাশ করার পর এই জেলার হর্তাকর্তা বিধাতা হবার পরও যে পুরনো দিনের সম্পর্ক ভুলে যায় নি, তা দেখে ভাল লাগল।

প্রদীপ নিয়োগীর মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে পথেঘাটে দেখলেই সবাই জিজ্ঞেস করছে, হ্যারে নতুন ডি-সি আর তুই নাকি একসঙ্গে কলেজে পড়েছিস?

শর্মিষ্ঠা একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে কটন কলেজে বি. এ. পড়েছি।

—এবার এখানে আসার পর যোগাযোগ হয়েছে?

—তিন-চারদিন আগে ও ফোন করেছিল কিন্তু তখন আমি স্কুলে ছিলাম। ওর স্ত্রী এলে একদিন যেতে বলেছে।

নমিতা বড়ুয়া টিচার্স কমনরুমে ঢুকতেই এক দল সহকর্মী প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, নমিদাদি, নতুন ডি-সি সাহেব বলে তোমার ওষুধ নেবার জন্য তোমার বাড়িতে গিয়েছিলেন?

নমিতাদি একটু হেসে বলেন, ঋষি তো ডি-সি হিসেবে আমার বাড়িতে আসে নি ; এসেছিল আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ও আমার বাড়িতে এসেছিল বলে তোরা এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন?

কোন একজন শিক্ষায়িত্রী বললেন, তার মানে নতুন ডি-সি সাহেব বেশ ভাল লোক।

নমিতাদি আবার হাসতে হাসতে বলেন, হাজার হোক আমাদের এই স্কুলেরই একজন পুরনো টিচারের ছেলে। ভাল হবে না কেন?

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, তবে আমার চাইতে ঋষিকে অনেক বেশি ভালভাবে চেনে সায়ন্তনী।

সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলল, ও কথা বলো না নমিতাদি। নিতান্ত সামনা-সামনি বাড়িতে থাকলে যে রকম আলাপ পরিচয় হয়, তাই ছিল। তার বেশি কিছু না।

যমুনা জিজ্ঞেস করল, এর মধ্যে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সায়ন্তনী একটু জোর করেই হেসে উঠে বলে, আমাদের সঙ্গে কত জনেরই বন্ধুত্ব হয় কিন্তু বড় হবার পর তাদের ক'জনের কথা আমরা মনে রাখি?

নমিতাদি বললেন, তা ঠিক কিন্তু দেখেছি এই ছেলেটা পুরনো দিনের প্রায় সবার কথাই মনে রেখেছে।

দু'এক সপ্তাহের মধ্যে এই নতুন ডি-সি সাহেব সম্পর্কে আরো কত কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে।

অমলেশ গুহ ছেলে আর বউকে নিয়ে দিন দশেকের জন্য গোয়ালপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে রঙ্গীন টি.ভি-ভি.সি. আর চুরি হয়ে গেছে। থানায় রিপোর্ট করতে গিয়ে দারোগাবাবুর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ। ঠিক তিন দিনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের একটা চরে এই শহরের এক রিকসাওয়ালার বাড়ি থেকে টি.ভি-ভি.সি. আর উদ্ধার করে অমলেশবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর সবিনয়ে বললেন, স্যার, দয়া করে ডি-সি সাহেবকে জানিয়ে দেবেন আমরা তিন দিনের মধ্যে আপনার সবকিছু উদ্ধার করে দিয়েছি।

নতুন ডি-সি সাহেবের ভয়ে যে পুলিশের লোকজন রাতারাতি সাধু হয়ে উঠেছে, সে খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না।

শুধু কি তাই? কোর্ট-কাছারি-সরকারী অফিসের কেরানী বা অফিসাররাও নাকি আর উপরি কিছু পাওনার দাবী করছেন না। সবারই ভয়, কখন যে ডি-সি সাহেব সাধারণ লোকজনের ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ওদের কীর্তিকলাপ হাতে হাতে ধরে ফেলবেন, তা কেউ জানে না।

নতুন ডি-সি সাহেব সম্পর্কে আরো কত গল্প ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। উনি নাকি কোন এক মালবাহী লরীর ড্রাইভারের পাশে ক্লীনার সেজে বসেছিলেন। তারপর চেক পোষ্টের দারোগাবাবু ঘুষ চাইতেই ডি-সি সাহেব স্বমূর্তি ধারণ করে সঙ্গে সঙ্গে এস. পি'কে হুকুম করলেন, ওকে সাসপেন্ড করে ভিজিলেন্স'কে সবকিছু জানাতে।

ওদিকে ডি-সি সাহেবের বাংলোয় ব্যাডমিন্টন খেলে এসে বৈশাখী মা-বাবা-পিসী-কাকাকে বলল, ঋষিদার স্ত্রীকে কি সুন্দর দেখতে, তা তোমরা ভাবতে পারবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, টি-ভি' তে লাক্স আর পন্ডস্'এর বিজ্ঞাপনে যে সব সুন্দরী মেয়েদের দেখা যায়, বৌদিকে দেখতেও ঠিক ঐ রকমই সুন্দরী।

বিকাশবাবু একটু হেসে বললেন, ঋষির শ্বশুরমশাই তো এখন অসমের চীফ সেক্রেটারী। বহুকাল আগে উনিও আমাদের এই ধুবড়ীর ডি-সি ছিলেন। তখন ওকে আর ওর স্ত্রীকে দেখে আমরা বলাবলি করতাম, বড়ুয়া সাহেব বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কোন সিনেমায় ওদের হিরো-হিরোইন করতেন।

ডি-সি সাহেবের স্ত্রীর রূপের সুখ্যাতির খবর প্রথমে ছড়িয়ে পড়ল বৈশাখী-বর্ষা-চৈতালীর বন্ধুদের মধ্যে। তারপর তাদের মা-মাসী-কাকিমাদের কৃপায় দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই ধুবড়ী শহরের প্রায় সব মহিলারাই জেনে গেলেন। আর মিসেস নন্দা নিয়োগীর জন্য সবাই জেনে গেল ডি-সি সাহেবের স্ত্রী দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন।

সেদিন কি কারণে যেন গভর্নমেন্ট গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে হাফ্ হলিডে হলো। দু'চারজন টিচার বাড়ি চলে গেলেও অধিকাংশ টিচারই ওদের ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কে যেন কথায় কথায় ডি-সি সাহেবের স্ত্রীর রূপ-গুণের কথা তুললো। তারপর নানাজনের নানা মন্তব্যের পর নমিতাদি একটু হেসে বললেন, হাজার হলেও ঋষির মা এই ধুবড়ীরই মেয়ে। ঋষিও যদি ধুবড়ীর কোন মেয়েকে বিয়ে করতো তাহলে আমি খুশি হতাম।

সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা হাসি হেসে বলল, নমিতাদি, তোমাদের ডি-সি সাহেব যে রকম সুন্দরী ও গুণী মেয়েকে বিয়ে করেছেন, সে রকম মেয়ে কী আমাদের এখানে আছে?

—ঠিক ঐ রকম মেয়ে না থাকলেও আমাদের এই শহরে কী ভাল লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়ে নেই?

সায়ন্তনী হাসতে হাসতে বলল, থাকলেও হয়তো তোমার স্নেহের ঋষির চোখে পড়েনি।

এইসব হাসি-ঠাট্টার মাঝখানেই হঠাৎ হেড মিস্ট্রেস একটা কাগজ হাতে নিয়ে টিচার্সদের ঘরে এসেই একটু হেসে বললেন, দু'টো সুখবর আছে।

উনি প্রায় না থেমেই বললেন, নতুন ডি-সি সাহেবের কৃপায় পাঁচ বছর পর আবার আমরা প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন করতে যাচ্ছি। তাছাড়া...

হেড মিসট্রেসকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সায়ন্তনী একটু হেসে বলল, ডি-সি সাহেবের কৃপায় মানে? উনি কী নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছেন?

হেড মিস্ট্রেস একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, নিজের পকেট থেকে না দিলেও এডুকেশন সেক্রেটারী-ফাইনান্স সেক্রেটারীদের ধরাধরি করে ডি-সি সাহেব টাকার ব্যবস্থা করেছেন।

উনি সায়ন্তনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডি-সি সাহেব আমাকে কি বলেছেন জানিস?

—আপনার সঙ্গে ডি-সি সাহেবের কি কথা হয়েছে, তা আমি জানবো কি করে?

—বলেছেন, আপনি যে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, সেই স্কুলেই আমার মা টিচার ছিলেন। আপনার স্কুলের ব্যাপারে আমার বিশেষ দায়িত্বও আছে, দুর্বলতাও আছে। স্কুলের ব্যাপারে যখন খুশি আমার বাংলোয় বা অফিসে চলে আসবেন। কাউকে কিছু বলতে হবে না।

উনি থামতেই নমিতাদি বললেন, শুধু ঋষির পক্ষেই এই ধরণের কথা বলা সম্ভব। ও দু'চার বছর এখানে থাকলে ধুবড়ীর চেহারাই বদলে যাবে।

নমিতাদি থামতেই হেড মিস্ট্রেস বললেন, আগামী আঠারই বিকেল চারটেয় প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন সেরিমনি হবে। ডি-সি সাহেব সভাপতিত্ব করবেন আর ওনারই পরামর্শ মত জ্যোতিদিকে প্রধান অতিথি করা হবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, কাল স্কুলের ছুটির পর টিচার্স মিটিং ডাকছি। কালকেই সবকিছু প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করতে হবে। হাতে তো বিশেষ সময় নেই।

নমিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই সবকিছু ঠিক করে ফেলতে হবে। আর একদিনও দেরি করা ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, পরের দিনের টিচারদের মিটিং-এ সবকিছু ঠিক করা হলো। সভার শেষে হেড মিস্ট্রেস বললেন, কাল থেকেই সবাই কাজ শুরু করে দাও। অনুষ্ঠান দেখে ডি-সি সাহেব যেন স্বীকার করতে বাধ্য হন যে আমাদের মত স্কুল এই রাজ্যে বিশেষ নেই।

গত বার্ষিক পরীক্ষায় যারা ফার্ষ্ট-সেকেন্ড-থার্ড হয়েছে, তাদের তালিকা তৈরি করার পরই নমিতাদি অফিসে খাতাপত্র ঘেটে দেখে নিলেন, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। তারপর ক্লাস টিচারদের কাছ থেকে জেনে নিলেন, কে কোন ক্লাসের অল রাউন্ড বেষ্ট গার্ল। সেকেন্ডারী-হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রীদের নামও জানা হয়ে গেল।

গেমস্ টিচার সুধাদি বার্ষিক স্পোর্টস'এ যারা প্রাইজ পাবে, তাদের লিষ্ট দিয়ে দিলেন নমিতাদিকে।

নমিতাদি আর তিন-চারজন টিচার যখন প্রাইজ দেবার জন্য বই ও অন্যান্য উপহারের তালিকা তৈরি করেছেন, তখন পিছন দিকের ঘরে পাঞ্চালীদি আর ঈশানীদি মেয়েদের নিয়ে পুরোদমে চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে স্বয়ং হেড মিস্ট্রেস আর সঙ্ঘমিত্রা সরকার পর্যন্ত শত ব্যস্ততার মধ্যেও হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসছেন রিহার্সাল দেখতে। ওদের দেখেই চৈতালী নাচ থামিয়ে দেয়।

ঈশানীদি গান থামিয়েই বলেন, থামলে কেন?

সঙ্ঘমিত্রা সরকার একটু হেসে বলেন, আমাদের দেখেই যদি লজ্জা পাও,

তাহলে সেদিন নাচবে কি করে?

পাঞ্চালীদি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, রেডি। ওয়ান, টু, থ্রী!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চৈতালীর নাচ আর ঈশানীদির গান—

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়
বাজায় বাঁশি
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী...

নাচ-গান থামতেই হেড মিস্ট্রেস এক গাল হাসি হেসে বললেন, অপূর্ব হচ্ছে। এখনই আমাদের বেরুতে না হলে পুরো রিহার্সাল দেখতাম।

না, ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বিশিষ্ট সরকারী অফিসার আর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করতে চলে যান। ডাকেও বেশ কিছু কার্ড পাঠানো হয়েছে। আর ছাত্রীদের হাতেই তাদের মা-বাবা-অভিভাবকদের কার্ড দেওয়া হয়েছে। এদিকে স্কুলের মাঠে ষ্টেজ আর প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে।

দিন যত এগিয়ে চলে, ছাত্রী আর শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে উত্তেজনাও তত বাড়ে। দিনগুলো যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। সতেরই সকালেই ডি-সি সাহেব হেড মিস্ট্রেসকে জানিয়ে দিলেন, উনিই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমতী জ্যোতি দাশগুপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

তারপর গভর্ণমেন্ট গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত দিন আঠারই এসে গেল।

সাড়ে বারোটা-একটার মধ্যেই সব শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা সেজেগুজে হাজির। দুটোর মধ্যেই ষ্টেজ সাজানো শেষ। আমন্ত্রিত ও বরেণ্য অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একদল ছাত্রী আর শিক্ষিকারা গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনটের সময়। অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগেই প্যান্ডেল ভরে গেল। চারটে বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে অনুষ্ঠানের সভাপতি ধুবড়ীর ডেপুটি কমিশনার মিঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী প্রধান অতিথিকে নিয়ে পৌঁছতেই শুরু হলো শঙ্খধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টি। হেড মিস্ট্রেসকে অনুসরণ করে ওঁরা দু'জনে মঞ্চে উঠতেই অতিথিবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ওদের সম্মান জানালেন। ওরা তিনজনে আসন গ্রহণ করতেই ঈশানীদির নেতৃত্বে দশ-বারোটি ছাত্রী শুরু করল—আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।

প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীমতী নমিতা বড়ুয়া বললেন, আজ সত্যি আমাদের আনন্দের দিন। সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় আমরা বেশ ক'বছর কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কৃত করতে পারিনি। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমাদের স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া

শ্রীমতী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শ্রী সপ্তর্ষি ব্যানার্জী এখানে ডি-সি হয়ে আসার পর সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগ করে অর্থের ব্যবস্থা করায় আজকের এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হচ্ছে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের নেই।

নমিতাদি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী জ্যোতি দাশগুপ্তাকে শ্রদ্ধা করেন না, এমন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধুবড়ীতে নেই। আমাদের গৌরব তিনিও দীর্ঘদিন এই স্কুলের শিক্ষিয়িত্রী ছিলেন এবং তাঁর অসংখ্য ছাত্রীদের মধ্যে একজন হলেন আমাদের ডি-সি সাহেবের মা। উনি আজকের অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ করে এসেছেন বলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

উনি আবার একটু থেমে বলেন, এবার আমাদের ছাত্রীরা অতিথিদের বরণ করবে ও শিক্ষিকা শ্রীমতী সঙঘমিত্রা সরকার পুষ্পস্তবক প্রদান করবেন। তারপরই পুরষ্কার বিতরণ-অনুষ্ঠান শুরু হবে।

হ্যাঁ, এইসব পর্ব শেষ হবার পর শুরু হলো পুরস্কার দেওয়া। ডি-সি সাহেবের হাত থেকে কৃতি ছাত্রীরা পুরস্কার নিতেই সমবেত অতিথিরা হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান। যত উঁচু ক্লাশের মেয়েরা পুরস্কার নেয়, তত বেশি হাততালি পড়ে। ক্লাশ নাইনে ফার্ষ্ট হবার জন্য চিত্রাঙ্গদার মেক আপ নিয়ে চৈতালী ষ্টেজে ঢুকতেই চারদিক থেকে হাততালি পড়তে শুরু করে। ডি-সি সাহেব পুরষ্কার দেবার পর হাসতে হাসতে ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেন।

এর পর শুরু হলো সেকেন্ডারী ও হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রীদের।

নমিতাদি ঘোষণা করলেন, সেকেন্ডারী পরীক্ষায় এই জেলার মধ্যে সেকেন্ড ও আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বৈশাখী চন্দ।...

বৈশাখী মঞ্চে উঠে হাসি মুখে ডি-সি সাহেবের দিকে এগুতেই সারা প্যান্ডেল যেন ফেটে পড়ল।

...সেকেন্ডারী পরীক্ষায় আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে সঞ্চয়িতা সরকার।

অর্জুনের বেশে সঞ্চয়িতা মঞ্চে প্রবেশ করতেই চারদিক থেকে হাসির বন্যা বয়ে গেল।

...হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় সমগ্র রাজ্যের সমস্ত ছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে আমাদেরই ছাত্রী চন্দ্রিমা গুহ।...

নমিতাদির ঘোষণা শেষ হবার আগেই শুরু হলো হাততালি।

পুরস্কার বিতরণ-পর্ব শেষ হবার পর প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বললেন, আজ

আমারও খুব আনন্দের দিন। যে আমাকে দিদিমা বলে ও যাকে আমি ডালিং বলি, সেই ঋষি আজ আমাদের ডি.সি ও আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি। ও স্কুলের জন্য যা করেছে, তা ভালই করেছে কিন্তু আমি বলছি, ওকে আরো অনেক কিছু করতে হবে। এই স্কুলের নানা সমস্যার সমাধান ওকে করতেই হবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে হাসতে হাসতে বলেন, ও যদি এইসব কাজ না করে, তাহলে ওকে আমি আর ডার্লিং বলে ডাকব না। ওকে আমি ডির্ভোস করে দেব।

ওঁর কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই।

ডি-সি সাহেব সভাপতির ভাষণে বললেন, আমি এই স্কুলের জন্য া করেছি, তারজন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার কর্তব্য করেছি। হাজার হোক আমিও তো এই ধুবড়ীরই ছেলে। আমার জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের দিনগুলি তো আমি এখানেই কাটিয়েছি। যে শহরের যে মানুষদের স্নেহ-ভালবাসায় আমি ধন্য হয়েছি, তা আমি কখনই ভুলতে পারি না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন কোন অন্যায় না করি আর আমি যেন আপনাদের সেবা করতে পারি।

ডি-সি সাহেবের এই আন্তরিক কথাগুলো শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন হেড মিস্ট্রেস।

তারপর শুরু হলো নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা।

নৃত্যনাট্য শেষ হবার পর ডি-সি সাহেব মঞ্চে এসে পরিচিত হলেন সঙ্গীত পরিচালিকা ঈশানীদি, নৃত্য পরিচালিকা পাঞ্চালীদি ও শিল্পীদের সঙ্গে। তারপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, চিত্রাঙ্গদা দেখে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এই স্কুলের ছাত্রীরা এত গুণী। তবে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালিকার অভাবনীয় কৃতিত্ব।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে পকেট থেকে কয়েকটি খাম বের করে বললেন, আপনাদের অনুমতি পেলে আমি চারটি বিশেষ পুরস্কার দিতে চাই।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাতেই ডি-সি সাহেব বললেন, সবার আগে পুরস্কৃত করতে চাই নৃত্য পরিচালিকা পাঞ্চালীদিকে।

পাঞ্চালী এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে একটি খাম নিতেই প্যান্ডেলের সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন।

—এবার আমি পুরস্কৃত করতে চাই সঙ্গীত পরিচালিকা ঈশানীদিকে।

উনিও একইভাবে অভিনন্দিতা হলেন।

—এবার আমি পুরস্কৃত করতে চাই অর্জুন সঞ্চয়িতা সরকার আর চিত্রাঙ্গদা

চৈতালী চন্দকে।

উঃ! সেকি হাততালি!

তারপর?

তারপর হেড মিস্ট্রেসের ঘরে বসে চা-টা খেতে সবার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা।

না, ডি-সি সাহেবের আর সময় নেই। জরুরী কাজে ওকে এখনই যেতে হবে। শ্রীমতী জ্যোতি দাশগুপ্তা ওকে বললেন, ডার্লিং, তুই যা। আমি এদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে বাড়ি যাবো।

হেড মিস্ট্রেস ও অন্যান্য অনেকে ডি-সি সাহেবকে বিদায় জানান। গাড়ি স্টার্ট দিতেই বৈশাখী ছুটে এসে গাড়ির জানলার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে চাপা গলায় বলে, ঋষিদা, তোমার একটা চিঠি। খুব প্রাইভেট।

ডি-সি সাহেবের গাড়ি ছেড়ে দিতেই নমিতাদি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যারে বৈশাখী, ঋষিকে কি দিলি?

ও মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে বলে, ঋষিদা কয়েকটা ঠিকানা জানতে চেয়েছিল, তাই...

ও!

ডি-সি সাহেব বাংলোয় পৌঁছেই চিঠিটা পড়তে শুরু করেন।...

আমি পাপড়ি। মনে পড়ে কি আমাকে? একটু পিছন ফিরে তাকালে বোধহয় অধ্যাপক ত্রিদিব সরকারের এই মেয়েটাকে মনে পড়তে পারে। ছাতিয়ান তলায় আমাদের ঠিক সামনের বাড়িতেই তোমরা থাকতে। এবার মনে পড়েছে?

সে যাইহোক তোমার অনেক অনেকগুলো প্রেমপত্র আমার কাছে আছে। কিছু কিছু চিঠি মাত্র দু'চার লাইনের, আবার বেশ কিছু চিঠি আট-দশ পাতার। তোমার প্রাক যৌবনের-চিঠিগুলোতে শুধু আমাকে ভালবাসার কথা কিন্তু তুমি কটন কলেজে পড়ার সময় যেসব দীর্ঘ চিঠিগুলো লিখেছিলে, তার প্রতি ছত্রে ছত্রে আমার রূপ-গুণ-মাধুর্যের কথা লেখা। লেখা আছে আমার দেহ লাবণ্যের কথা।

তুমি নিশ্চয়ই পুরনো দিনের অনেক কথা, অনেক স্মৃতি ভুলে গিয়েছ। তাইতো তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য দু'চারটে কথা লিখছি। তুমি তখন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়ো। গরমের ছুটিতে তুমি ধুবড়ী আসার পর পরই শুরু হলো তুমুল বর্ষা। ঠিক সেই সময় আলিপুর দুয়ার থেকে খবর এলো, আমার জ্যেঠুর শরীর খুব খারাপ এবং বাবা সঙ্গে সঙ্গে ওখানে চলে গেলেন। সে সময় মা আর আমার নিরাপত্তার জন্য রাত্রে তুমি আমাদের বাড়িতে শুতে আসতে। মা কামপোজ খেয়ে

ঘুমিয়ে পড়ার পর তুমি চুপি চুপি আমার ঘরে এসে আমাকে নিয়ে কি পাগলামীই করতে! মনে পড়ে কি সে সময় অন্তত দশ-বারো রাত আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত কাটিয়েছি? মনে পড়ে কি তুমি গুয়াহাটি ফিরে যাবার পর ঐসব অবস্মিরণীয় রাত্রির স্মৃতি রোমন্থন করে আমাকে কত চিঠি লিখেছ?

এই চিঠিগুলো নিয়ে কি করি বলতে পারো? মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার কীর্তি সবাইকে জানিয়ে দিই। আবার কখনও কখনও মনে হয়, তোমার বিরুদ্ধে মামলা করি কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয়, না, না, তা হয় না। যাকে প্রাণ মন দিয়ে ভাল বেসেছি, তার ক্ষতি করতে পারি না। নেহাত চাকরিতে একটু বেশি সুযোগ সুবিধে পাবে বলে চীফ সেক্রেটারীর মেয়েকে বিয়ে করেছো বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি কিন্তু তোমার মত স্বার্থপর নীচ হতে পারবো না।...

দিন দশেকের মধ্যেই ডি-সি সাহেব হঠাৎ করিমগঞ্জ বদলী হয়ে গেলেন। ধুবড়ীর সবাই অবাক।

শুধু সায়ন্তনী জানল, ডি-সি সাহেব পালিয়ে গেলেন।
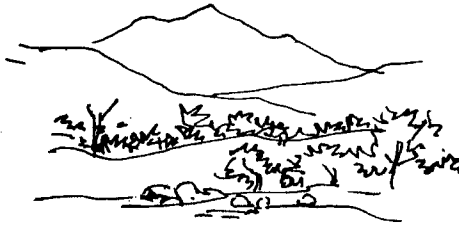
দেব দর্শন

শ্যামলী চায়ের কাপ নিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায়। চাপা হাসি হাসতে হাসতে কয়েক মুহূর্ত সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, পিসীমনি, আর আদর দিয়ে আমার স্বামীর মাথাটা খেও না।

শ্যামলী একটু এগিয়ে বেড সাইড টেবিলের উপর চায়ের কাপ রেখেই পিসীমনিকে বলে, বুড়ো ধাড়ী ছেলেকে আর আদর করতে হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। কি রান্নাবান্না হবে, তা বলে না দিলে সরমা কাজ শুরু করতে পারছে না।

শান্তিলতা বলেন, আমি তো কখন থেকে উঠব উঠব করছি কিন্তু ছেলেটা যদি না ছাড়ে, তাহলে যাই কী করে?

—শুধু শুধু ছেলের দোষ দিচ্ছো কেন? তুমি নিজেই তো ওকে আদর না করে থাকতে পারো না।

শান্তিলতা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী করবো বলো? অনেক দিনের অভ্যাস! আমি গায়-মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে ছেলেটা তো কোনকালেই বিছানা ছাড়তে পারে না।

শ্যামলীও সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমিও তো ছেলেকে আদর না করে শান্তি পাও না।

পবিত্র পাশ ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বলল, মা পিসী, যাও যাও। সত্যি বেশ বেলা হয়ে গেছে।

শুধু সেদিন না, প্রতিদিনই এইভাবে দিনের শুরু হয়।

বৌদি মারা গিয়েছেন। আমার কান্নাকাটি দেখে আমার বড় ভাসুর পরদিনই আমাকে বড় ভাসুরপোর সঙ্গে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

শান্তিলতা একটু থামেন, একটু হাসেন। তারপর বলেন, দাদা রাজাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, যদি পারিস তুই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখিস।

শ্যামলীও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তারপর?

শান্তিলতা দু'চার মিনিট চুপ করে থাকেন। আপনমনে কত কি ভাবেন। তারপর বলেন, রাজা যখন হয়, তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। আমার শ্বশুরবাড়ি অত্যন্ত গোঁড়া পরিবার। তাই হাজার রকম নিয়ম-কানুন মেনে অত্যন্ত সংযত জীবন কাটাতাম বলে তখন ঐ বয়সেও আমাকে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবতী মনে হতো।

শ্যামলী চুপ করে ওর কথা শোনেন।

—রাজা যখন দুধ খাবার জন্য আমার বুক চুষতো কিন্তু কিছুই পেতো না, তখন আমার যেমন অস্বস্তি তেমনই কান্না পেতো। যতই বোতলের দুধ খাওয়াই না কেন, ও আমার বুক না চুষে থাকতে পারতো না।

—মা মরা ঐটুকু বাচ্চাকে মানুষ করা সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার।

—তা ঠিক কিন্তু আমি তো জীবনে স্বামীও পাইনি, সন্তানও পাইনি। তাইতো রাজাকে পেয়ে যেমন গর্ব, সেইরকমই আনন্দ হতো।

—তারপর?

শান্তিলতা হো হো করে হেসে উঠেই বলেন, সময় কী দাঁড়িয়ে থাকে? দেখতে দেখতে রাজা বড় হলো, যাদবপুর থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলো, ভাল চাকরি পেলো; তারপর তোমাকে আমার এত ভাল লাগল যে তিন মাস আগে তোমার সঙ্গে রাজার বিয়ে দিয়ে দিলাম।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দুঃখ শুধু একটাই ; দাদা তোমাকে দেখে যেতে পারলেন না।

দু'চার মিনিট দু'জনের কেউই কোন কথা বলেন না। তারপর শ্যামলী একটু হেসে প্রশ্ন করে, আচ্ছা পিসীমনি, ও তোমাকে মা-পিসী বলে কেন?

শান্তিলতা একটু উদাস দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, সব শিশুই প্রথমে মা বলতে শেখে। রাজার যখন বুলি ফোটে, তখন ও আমাকে দেখলেই মা মা বলতো। শুনতে আমার ভাল লাগলেও মুখে বলতাম, আমি তোর পিসী।

উনি চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, না, না, ও তোকে পিসী বলে ডাকবে না। ও তোকে মা বলেই ডাকবে। তুই ওকে পেটে ধরিস নি

বলে কী ও তোর ছেলে না?

শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, তাহলে ও কেন...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শান্তিলতা বলেন, রাজা একটু বড় হবার পরই এক দল আত্মীয় আর প্রতিবেশী ওকে সব সময় বলতো, তুই যাকে মা বলিস, সে তোর পিসী ; মা না।...

শ্যামলী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে, লোকগুলো তো ভারী অসভ্য, ভারী নোংরা।

শান্তিলতা একটু হেসে বলেন, রাজা আমাকে মা না ডেকে থাকতে পারতো না, আবার ওদের পাল্লায় পড়ে কখনও কখনও পিসীও বলতো। তারপর বছর পাঁচেক বয়স থেকে ও হঠাৎ আমাকে মা-পিসী বলে ডাকতে শুরু করলো।

একটু চুপ করে থাকার পর শ্যামলী চাপা হাসি হেসে বলে, আচ্ছা পিসীমনি, ছেলেকে নিয়ে তোমার খুব গর্ব, তাই না?

—গর্ব কেন হবে?

—ওর মত মাতৃভক্ত ছেলে ক'জনের কপালে জোটে? তুমি যা বলো, তাইতো ওর কাছে বেদবাক্য।

—ও ঘোড়ার ডিম আমার কথা মেনে চলে!

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি বামুনের ঘরের বিধবা। এক বেলা নিরামিষ খাই। জীবনে কখনও কায়েতের হাতে জল খাইনি আর ছেলেটা হয়েছে ঠিক উল্টো স্বভাবের।

শ্যামলী কোন কথা বলে না। শুধু চাপা হাসি হাসে।

শান্তিলতা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, রাজা তখন মাত্র এগার বছরের। ক্লাশ সিক্সে উঠেছে। হঠাৎ একদিন ও স্কুল থেকে এক বন্ধুকে নিয়ে হাজির হয়েই চিৎকার করে বলল, মা-পিসী, আমার এই বন্ধু দারুণ সুন্দর কীর্তন আর ভাটিয়ালী গান গায়।

—তারপর?

—তারপর ছেলেটার গান শুনে সত্যি আমার খুব ভাল লাগল বলে ছেলেটাকে আদর করে পাশে বসিয়ে খাইয়ে ওর নাম জিজ্ঞেস করতেই আমার মাথায় বজ্রাঘাত!

শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, কেন?

—আর কেন? ছেলেটা তিলি।

শান্তিলতা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আমাকে যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

এইসব জাতপাতের ব্যাপার শ্যামলী মানে না। তবু কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে।

শান্তিলতা আবার বলেন, দুনিয়ার যত অ-জাত কু-জাতের ছেলেদের সঙ্গেই ছিল রাজার বন্ধুত্ব। ও যেমন যখন তখন ঐসব ছেলেদের বাড়ি থেকে হরদম খেয়েদেয়ে আসতো, আবার বাড়িতে এনেও তাদের খাওয়াতো।

—তুমি ওকে বকতে না কেন?

—বকবো কি করে? ছেলেগুলো তো ভাল ছিল। রাজার মত ওরাও তো আমাকে মা-পিসী বলে ডাকতো ; খুব শ্রদ্ধাও করতো। ওরাও তো আমার সন্তানের মতই ছিল।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার বলেন, যদি কদাচিৎ কখনও রাজাকে কিছু বলতাম, তাহলে ও বলতো, কে কি জাতের, সেইসব জেনে কি কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়?

—তুমি কী বলতে?

—কী আর বলব? রাজার সাঙ্গপাঙ্গদের সেবা-যত্ন করে আবার চান করে মাথায় গঙ্গাজল দিতাম।

শান্তিলতা মুহূর্তের জন্য থেমেই একটু হেসে বলেন, একটু বড় হবার পর ও যখন অ-জাত কু-জাতের মড়া নিয়ে শ্মশান যাওয়া শুরু করলো, তখন কিছু বললে কি বলতো জানো?

—কী বলতো?

—বলতো, রামকৃষ্ণ বলেছেন, সব মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন। রামকৃষ্ণের চাইতেও কি তুমি বেশি ধার্মিক?

কথাটা শুনে শ্যামলী না হেসে পারে না। তারপর হাসি হাসলে প্রশ্ন করে, তুমি কি বলতে?

—কী আর বলব? আমি কি বলতে পারি, ঠাকুরের চাইতে আমি বেশি ধার্মিক?

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে পবিত্র-শ্যামলীর ছেলে গৌতমও কত বড় হয়ে গেল। সেও বাবার মত যাদবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং'এ ভর্তি হলো। এই নাতিই এখন শান্তিলতার চোখের মনি। গৌতমও মা-বাবার চাইতে ঠাম্মাকে অনেক বেশি ভালবাসে, অনেক বেশি কাছের মানুষ মনে করে।

সেদিন কি কারণে যেন সবকিছু বন্ধ ছিল। সাত সকালেই শান্তিলতার ঘরে আড্ডা শুরু হয়েছে। গৌতম ঠাম্মার কোলে মাথা দিয়েই শুয়ে আছে। পবিত্রও পাশেই শুয়ে আছে। ওদের মুখোমুখি বসে আছে শ্যামলী। সরমা মাঝে মাঝেই চা দিয়ে যাচ্ছে।

নানা আলাপ-আলোচনার মাঝখানেই গৌতম বলল, বাবা, এবার কিন্তু গরমের ছুটিতে কোন হিল ষ্টেশনে যাবো না।

পবিত্র জিজ্ঞেস করে, তাহলে কোথায় যাবি?

—পাহাড়েই যাবো কিন্তু দার্জিলিং-শিলং-নৈনীতাল না।

শ্যামলী প্রশ্ন করে, উটি যাবি?

—না, না, উটি না। এবার কেদার-বদ্রী যাবো।

শান্তিলতা সঙ্গে সঙ্গে নাতিকে বলেন, আমি এই বুড়ো বয়সে কেদার-বদ্রী যাবো কি করে?

গৌতম বলে, কেন যেতে পারবে না ঠাম্মা? এখন তো বদ্রীনাথ অবধি বাস যাচ্ছে আর ওদিকে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত বাস যায়। বাকি চোদ্দ কিলো মিটার তুমি ঘোড়ায় যাবে।

শান্তিলতা একটু হেসে আলতো করে নাতির গালে একটা চড় মেরে বললেন, দূর হতভাগা! আমি কি ঘোড়ায় চড়তে পারি?

গৌতম সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে ঠাম্মার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, তোমার চাইতেও কত বেশি বয়সের বুড়ো-বুড়ীরা এইভাবে কেদার যায়, তা জানো?

ও একগাল হাসি হেসে দু'হাত দিয়ে ঠাম্মার গলা জড়িয়ে বলল, তোমার ভয় কি? তোমার বয়-ফ্রেন্ড তো তোমার সঙ্গে থাকবে।

—ঠিক আছে, চল। তোর জন্য যদি বাবা কেদারনাথের দর্শন হয়, তাহলে...

শান্তিলতা কথাটা শেষ করার আগেই গৌতম ঠাম্মার দু'গালে চুমু খেয়ে বলে, ভেরি গুড গার্ল!

হো হো করে হেসে ওঠে পবিত্র আর শ্যামলী।

ওদের হাসি থামলে শান্তিলতা বললেন, হ্যারে রাজা, যাতায়াতের পথে আমি কিন্তু কয়েক দিন হরিদ্বারে থাকব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থাকবে।

অফিসে ছুটির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র ডুন এক্সপ্রেসে চারটে ফার্ষ্ট ক্লাশ বার্থ রিজার্ভ করলো। তারপর হরিদ্বারে ইউ. পি. গভর্ণমেন্টের টুরিষ্ট লজ-এ ঘর আর কেদার-বদ্রী যাবার জন্য গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমকে টি-এম-ও করে বেশ কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিল। শ্যামলী আর গৌতম কিছু কেনাকাটা করার পর পরই শুরু হলো সুটকেশ গোছানো। হাতের বাকি ক'টা দিন দেখতে দেখতে শেষ হলো। এরই মধ্যে হরিদ্বার থেকেও খবর এসে গেছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে নির্দিষ্ট দিনে শুরু হলো যাত্রা।

ডুন এক্সপ্রেসে দুটো রাত ও পুরো একটা দিন হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করেই মহানন্দে কেটে গেল।

মাত্র দশ-পনের মিনিট লেট করে ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডুন এক্সপ্রেস পৌঁছল হরিদ্বার।

গৌতম সবার আগে আগে প্ল্যাটফর্মে নেমেই বলল, ঠাম্মা, তুমি নেমে এসো।

শান্তিলতা ডান হাত দিতে হাতল ধরে পা বাড়াতেই ধপাস করে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, আঃ!

এক লাফে নীচে নামল পবিত্র। তার পিছন পিছন শ্যামলী। তারপর ওরা তিনজন মিলে ওকে টেনে তুলতেই শান্তিলতা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, নারে রাজা, আমি দাঁড়াতে পারছি না।

তারপর?

তারপর কোন রকমে টুরিষ্ট লজ পৌঁছেই ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ তারে পবিত্র আর গৌতম শান্তিলতাকে নিয়ে গেল হাসপাতাল। ডাঃ তেওয়ারী পরীক্ষা করেই বললেন, মনে হচ্ছে পায়ের পাতায় ফ্রাকচার হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে হলো। প্লেট দেখেই ডাঃ তেওয়ারী বললেন, যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই।

শান্তিলতায় পা প্ল্যাষ্টার করে দেবার পর প্রেসক্রিপসন লিখতে লিখতেই ডাঃ তেওয়ারী বললেন, ছ'সপ্তাহ পর কলকাতায় একবার কোন ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন। আপাততঃ ডান পায়ে যেন কোন চাপ না পড়ে।

এমন অঘটন যে ঘটবে, তা কেউই ভাবতে পারে নি। পবিত্র বা শ্যামলী ঠিক বুঝতে পারছে না কি করা উচিত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পবিত্র বলল, মা-পিসী, তোমাকে ফেলে আমরা কেদার-বদ্রী যাব না।

শান্তিলতা অবাক হয়ে বললেন, তোরা নিশ্চয়ই যাবি। আমি এই ক'টা দিন এখানেই থাকব।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এতদিনের এত উদ্যোগ-আয়োজনের পর তোরা যদি না যাস, তাহলে আমি শান্তি পাবো না।

শ্যামলী বলল, পিসীমনি, তোমাকে একলা রেখে কি আমরা যেতে পারি? তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে কি আমরা শান্তিতে ঘুরতে পারবো?

—বৌমা, আমাকে লাঠিতে ভর দিয়ে বাথরুমে যেতে হবে। তাছাড়া আমি তো সব কাজই করতে পারবো।

এইসব আলাপ-আলোচনা চলতে চলতেই হঠাৎ গৌতম বলল, বাবা, তুমি আর

মা চলে যাও। আমি এই ক'টা দিন ঠাম্মার কাছেই থাকবো।

শান্তিলতা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কেদার-বদ্রীর প্রোগ্রাম তো তোরই জন্য করা হলো আর তুইই যাবি না, তাই কখনো হয়?

উনি একটু থেমে বলেন, তোরা তিনজনেই যা। আমি এই ক'দিনে তারাশঙ্করের গণদেবতা আর আরোগ্য নিকেতন পড়ে শেষ করে ফেলব!

গৌতম একটু হেসে বলল, তোমার মত সুন্দীর যুবতীকে আমি একলা রেখে যেতে পারবো না।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

হাসি থামলে গৌতম আবার বলে, আমি তো বুড়ো হয়ে যাইনি। কেদার-বদ্রী যাবার বহু সুযোগ আমার জীবনে আসবে।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত যথা নির্দিষ্ট দিনে পবিত্র আর শ্যামলী কেদার-বদ্রীর পথে হৃষিকেশ রওনা হলো।

দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। আট দিনের দিন ফিরে এলো পবিত্র আর শ্যামলী। দু'জনেই অত্যন্ত খুশি, অত্যন্ত উত্তেজিত।

পবিত্র চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, মা-পিসী, সত্যি বলছি, জন্ম জন্ম তপস্যা না করলে কেদার-বদ্রী দর্শন সম্ভব না। আমার যে কি ভাল লেগেছে, তা তোমাকে বলতে পারবো না।

শ্যামলী বলল, পিসীমনি, হিমালয়ের রূপ দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আবার আমাকে কেদার-বদ্রী যেতেই হবে।

পবিত্র জিজ্ঞেস করল, মা-পিসী, এই ক'টা দিন তোমরা কি করে কাটালে? খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই?

শান্তিলতা একটু চাপা হাসি হেসে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বললেন, দাদুভাই, তুই বলে দে তো আমরা কেমন ছিলাম।

গৌতম এক গাল হাসি হেসে বলল, বাবা, তোমরা ভাবতে পারবে না আমরা কি দারুণ মজা করে দিনগুলো কাটিয়েছি।

পবিত্র একটু হেসে বলে, কিন্তু মা-পিসী, যতই আনন্দে দিন কাটাও না কেন, তোমার তো কেদার-বদ্রী দর্শন হলো না।

শান্তিলতা নির্বিকার ভাবে বললেন, তারজন্য আমার দুঃখ নেই।

—সেকি?

—হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি।

—তুমি যাই বলো, তুমি বামুন ছাড়া আর সব মানুষকে ঘেন্না করো বলেই

তোমার কপালে কেদার-বদ্রী যাওয়া হলো না।

পবিত্র মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি সব মানুষকে সমানভাবে দেখি বলেই কেদার-বদ্রী আমাকে কৃপা করলেন।

শান্তিলতা একটু হেসে বললেন, আমি তো নিত্য কেদারনাথ-বদ্রীনাথ-বাবা বিশ্বনাথের দেখা পাই।

—তার মানে?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে শান্তিলতা পবিত্র'র দিকে তাকিয়ে বলেন, দ্যাখ রাজা, তুইই আমার কেদারনাথ-বদ্রীনাথ, তুইই আমার বাবা বিশ্বনাথ। তোকে বুকের মধ্যে পেলেই আমি সব ঠাকুর দেবতার দর্শন পেয়ে যাই।

শান্তিলতার চোখে-মুখে ভুবনভোলানো মাতৃত্বের ছবি দেখে পবিত্র মুগ্ধ-বিমুগ্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখার পর বলল, মা-পিসী, তোমার কাছে হেরে গেলাম। আজ বুঝলাম, কেন তুমি কোন তীর্থে যেতে চাওনি। তুমি সত্যিই অনন্যা। ইউ আর রিয়েলী এ গ্রেট মাদার!

শিউলি

মালপত্র গুছিয়ে রাখার পর হট কেসটাকে দেখিয়ে শৈবাল বললেন, দোয়েল-কোয়েল, তোমরা আগে দাদুনকে খাইয়ে দিও। তারপর তোমরা দু'জনে...

উনি কথাটা শেষ করার আগেই দোয়েল একটু হেসে বলল, তোমার ভয় নেই। তোমার বাবাকে আমরা না খাইয়ে রাখব না।

এবার উনি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা দাদুনকে একলা রেখে কোথাও যাবে না। দাদুনের সব কথা শুনবে।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে দাদুনের গলা জড়িয়ে ধরে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, এই বুড়ো! শুনলে তো ছেলের কথা? আমাদের পারমিশান না নিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

দোয়েল বলে, তুই কিছু চিন্তা করিস না কোয়েল। পুরীতে তো দাদুন ছেলেকেও কাছে পাবে না, পুত্রবধূকেও কাছে পাবে না। আমরা যা বলব, বুড়োকে তাই শুনতে হবে।

ওদের কথায় শুধু শৈবাল আর বৃদ্ধ অনিলবাবু না, সামনের বার্থের বৃদ্ধা ও মধ্যবয়সী ভদ্রলোকও হাসেন।

শৈবাল ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন, আপনারাও কী পুরী যাচ্ছেন?

উনি পাশের বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেন, আমার মাসীমা যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি না।

শৈবাল বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলেন, মাসীমা, আপনিও মেয়ে দুটোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমরাই দিদাকে দেখব!

বৃদ্ধা এক গাল হাসি হেসে বলেন, আমার মত বুড়ীকে দেখাশুনা করতে তোমাদের কষ্ট হবে না তো?

—না, না, কিছু কষ্ট হবে না।

দোয়েল মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এই বুড়োকে যদি সামলাতে পারি, তাহলে আপনার মত সুন্দরী দিদাকে দেখাশুনা করতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

বৃদ্ধা চাপা হাসি হেসে বলেন, আমাকে আর সুন্দরী বলো না। তোমাদের মত সুন্দরী তো চোখেই পড়ে না।

কোয়েল বলে, ও কথা বলবেন না দিদা। আপনাকে এই বয়সেই যখন এত সুন্দর দেখতে, তখন অল্প বয়সে যে কত সুন্দর ছিলেন, তা ভাবাই যায় না।

উনি চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমরা যাই বলো না কেন, আমি অল্প বয়সেও তোমাদের মত সুন্দর ছিলাম না।

বৃদ্ধ অনিলবাবু একবার হাতের ঘড়ি দেখেই ছেলেকে বললেন, হ্যারে খোকা, তুই এবার যা। বাড়িতে বৌমা একলা আছেন।

দোয়েল বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, তুমি যাও। মায়া মাসী আজ কাজে আসবে না। মা অনেকক্ষণ একলা একলা আছে।

শৈবাল বাবাকে প্রণাম করার পর দুই মেয়েকে একটু আদর করে ট্রেন থেকে নামার আগে বলেন, তোমরা রোজ একবার করে ফোন করতে ভুলে যাও না।

দোয়েল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজই ফোন করবো। সময় পেলে তুমিও ফোন করো

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার বোনপো মাসীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

দু'পাঁচ মিনিট পরই ট্রেন ছাড়ল।

ট্রেন ছাড়ার পর পরই কোচ অ্যাটেনডান্ট চার্টের উপর চোখ বুলিয়েই অনিলবাবুকে জিজ্ঞেস করে, আপনি মিঃ ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

—আর ওরা দু'জনে মিস ডি ব্যানার্জী আর মিস কে. ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

এবার কোচ অ্যাটেনড্যান্ট বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি মিসেস চৌধুরী?

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

কোচ অ্যাটেনডান্ট সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

দোয়েল হট কেস খুলতে খুলতেই বলে, দাদুন, হাত ধুয়ে এসো।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে সাবান-তোয়ালে বের করে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয়।

অনিলবাবু বাথরুম থেকে ঘুরে আসতেই দোয়েল ওর হাতে লুচি-আলুর দমের প্লেট তুলে দেয়।

দ্বিতীয় প্লেটটি ও মিসেস চৌধুরীর দিকে এগিয়ে ধরতেই উনি একটু হেসে বললেন, দিদি, তোমরা খাও। আমি খেয়ে এসেছি।

কোয়েল বলে, বাড়ি থেকে যা খেয়ে এসেছেন, তা এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে।

দোয়েল বলে, এই ছোট্ট ছোট্ট দু'চারটে লুচি খেতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। আমরা তিনজনে খাবো আর আপনি খাবেন না, তাই কখনো হয়?

—কিন্তু...

—না, না, দিদা, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। নিন, নিন, ধরুণ।

মিসেস চৌধুরী প্লেট হাতে নিতেই কোয়েল ওর দিকে তাকিয়ে বলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্ল!

ওর কথা শুনে উনি না হেসে পারেন না।

খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী অনিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার এই দুটি নাতনী কী যমজ?

—হ্যাঁ।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে বলে, দাদুন, মিথ্যে কথা বলছ কেন?

ও মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা যমজ না। দিদি আমার থেকে সাত মিনিটের বড়।

মিসেস চৌধুরী চাপা হাসি হেসে বলেন, তাহলে তো তোমরা যমজ না!

লুচি-আলুর দমের পর্ব শেষ হতেই দোয়েল সবাইকে মিষ্টি দেয়।

মিষ্টি খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী দোয়েল-কোয়েলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা বুঝি একটু রাত করে খাওয়া-দাওয়া করো?

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ।

দোয়েল বলে, দশটা পর্যন্ত তো আমরা পড়াশুনাই করি। তারপর আমরা সবাই মিলে একটু আড্ডা দেবার পরই সবাই এক সঙ্গে খেতে বসি।

—তোমার দাদুনও অত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেন?

ও হাসতে হাসতে বলে, আমরা দুই বউ দু'পাশে না বসলে তো বুড়ো খেতেই পারে না।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, জানেন দিদা, এই বুড়ো যেমন আমাদের দু'জনকে দু'পাশে না নিয়ে ঘুমুতে পারে না, আমরা দু'জনেও বুড়োকে কাছে না নিয়ে শুতে পারি না।

—তোমাদের দাদুন সত্যি ভাগ্যবান।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনিলবাবু মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ, সত্যি আমি ভাগ্যবান। শুধু এরা দু'জনে না, আমার ছেলে আর পুত্রবধূও অসম্ভব ভাল।

দাদুনকে শুইয়ে দেবার পর দোয়েল-কোয়েল উপরের বার্থে যায়। দোয়েল বার্থের বাইরে মুখে নিয়ে মিসেস চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে, দিদা, আপনি কোথায় উঠবেন?

—আমি বরাবরই হালদার মশায়ের পুরী হোটেলে উঠি।

ও একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, আমরাও তো পুরী হোটেলেই উঠব।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদা, আমরা পাশাপাশি ঘরে থাকব। আপনি পাশের ঘরে থাকলে খুব মজা হবে।

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, তোমাদের দু'জনকে কাছে পেলে তো আমিও আনন্দে থাকব।

হ্যাঁ, ওরা পাশাপাশি ঘরেই থাকেন। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব আর সমুদ্রের ধারে, জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে দু'তিনটে দিন বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। বাইরে না বেরিয়ে ঘরে বসেই ওরা সবাই গল্পগুজব করছিলেন। হঠাৎ কথায় কথায় মিসেস চৌধুরী অনিলবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, বৌদিকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, সে বহুকাল আগেই মারা গিয়েছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার ছেলে যখন মাত্র ছ'বছরের তখনই আমার স্ত্রী মারা যান।

কথাটা শুনেই মিসেস চৌধুরী অবাক হন। সঙ্গে সঙ্গেই উনি প্রশ্ন করেন, তখন ঐটুকু বাচ্চাকে কে দেখাশুনা করতেন?

অনিলবাবু জবাব দেবার আগেই দোয়েল বলে, দাদুনই তো বাবাকে মানুষ করেছেন।

ও প্রায় না থেমেই একটু হেসে বলে, বাবা তো আমাদের দুই বোনকে সব সময় বলেন, তোমাদের চাইতে তোমাদের দাদুনকে আমি হাজার গুণ বেশি ভালবাসি।

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, ওটা উনি মজা করে বলেন।

কোয়েল বলে, না, না, দিদা, বাবা সত্যি দাদুনকে অনেক বেশি ভালবাসে।

দোয়েল ডান হাত দিয়ে দাদুনের গাল টিপে আদর করে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলে, বাবা-মা যাকে ইচ্ছে ভালবাসুক, আমরা এই বুড়োকে নিয়ে মহা সুখে আছি।

ওর কথা শুনে মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, সে তো আমি নিজের চোখেই দেখছি।

উনি একটু থেমে অনিলবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনার স্ত্রী যখন মারা যান, তখন আপনার বয়স কত?

—ঠিক তিরিশ।

—মাত্র তিরিশ?

—হ্যাঁ।

—ঐ বয়সে তো অনেকে বিয়েই করেন না।

মিসেস চৌধুরী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই প্রশ্ন করেন, আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন?

অনিলবাবু একটু হেসে বলেন, মা জোর করে বিয়ে না দিলে আমি বিয়েই করতাম না। দ্বিতীয় বার বিয়ের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, দাদুন, তুমি বিয়ে করতে চাওনি কেন?

—এমনি।

—ইস! কি আমার সাধু?

দোয়েল গম্ভীর হয়ে বলে, দাদুন, আমরা কচি বাচ্চা না। আমরা মাধ্যামিক পাশ করে কলেজে পড়ছি। আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। সত্যি করে বলো, কেন বিয়ে করতে চাওনি।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলেন, সত্যি বলছি বড় বউ, আমি এমনি বিয়ে করতে চাইনি।

কোয়েল ফৌজদারী উকিলের মত জেরা করে, সত্যি করে বলো তো কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছিলে কিনা।

ওর প্রশ্ন শুনে শুধু অনিলবাবু না, মিসেস চৌধুরীও হো হো করে হেসে ওঠেন।

—দাদুন, হাসি দিয়ে ছোট বউকে ভোলাতে পারবে না। আমার কথার জবাব দাও।

—সত্যি বলছি ছোট বউ...

বৃদ্ধকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দোয়েল বিদ্যুত গতিতে ওর দুটি হাত

ওদের দুই বোনের মাথায় চেপে ধরে গম্ভীর হয়ে বলে, আমাদের মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে কথা বলবে না।

বৃদ্ধ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, বড় বউ, আমি সত্যি একটা মেয়েকে ভালবাসতাম।

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়!

কোয়েল বলল, তোমার মত হ্যান্ডসাম ছেলে যৌবনে প্রেমে পড়েনি, তাই কখনো হয়?

ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে মিসেস চৌধুরী শুধু হাসেন।

দোয়েল বৃদ্ধের মুখের সামনে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে, যে মেয়েটিকে ভালবাসতে, তার নাম কি?

—শিউলি।

কোয়েল চিৎকার করে বলে, হাউ রোমান্টিক!

দোয়েল আবার প্রশ্ন করে, উনি নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন?

—হ্যাঁ, বড় বউ, শিউলি খুবই সুন্দরী ছিল।

বৃদ্ধ অনিলবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন, ও লেখাপড়ায় যেমন ভাল ছিল, সেইরকমই ভাল গান গাইতে পারতো।

কোনমতে হাসি চেপে কোয়েল জিজ্ঞেস করে, কিভাবে তোমাদের ভাব হলো?

বৃদ্ধ চাপা হাসি হেসে বলেন, আমার বাবার মত শিউলির বাবাও রেলের ডাক্তার ছিলেন। আমরা পাশাপাশি বাংলোয় থাকতাম।

—প্রথম যখন আলাদা হয়, তখন তোমাদের বয়স কত?

গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে দোয়েল।

—আমাদের কারুরই বয়স বেশি ছিল না। বলতে পারো কিশোর-কিশোরীর প্রেম কিন্তু দু'জনেই দু'জনকে খুব ভালবাসতাম।

কোয়েল হাসতে হাসতে বলে, দাদুন, তুমি কি পাকাই ছিলে!

—যাই বলো ছোট বউ, শিউলিকে দেখলে বা তার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমরাও তাকে না ভালবেসে থাকতে পারতে না।

দোয়েল প্রশ্ন করে, শিউলিকে বিয়ে করলে না কেন?

—আমার বাবা তখন কলকাতা থেকে ধানবাদ বদলী হয়ে গেছেন। আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। ঐ সময় হঠাৎ জানতে পারলাম, শিউলির বাবা-মা অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন।...

—ও মাই গড!

দোয়েলর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যায়।

—ঐ অ্যাকসিডেন্টের পরই শিউলি আর ওর দিদিকে বোধহয় কোন আত্মীয় নিয়ে যায় কিন্তু আমরা ওদের ঠিকানা না জানায় কোন চিঠিপত্রও লিখতে পারলাম না।

—কিন্তু উনি তো তোমাদের ঠিকানা জানতেন।

দোয়েল মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, উনি তো তোমাকে চিঠি দিতে পারতেন।

বৃদ্ধ অনিলবাবু ম্লান হাসি হেসে বলেন, বড় বউ, মিসফরচুন নেভার কামস্ অ্যালোন। ঠিক ঐ সময়ই আমার বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করতে শুরু করলাম।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, শিউলি নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু ওর চিঠি আসার আগেই তো আমি বেনারস ছেড়ে চাকরি নিয়ে কটক চলে গেছি।

মিসেস চৌধুরী মুখ নীচু করে থাকেন। দোয়েল আর কোয়েলও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোয়েল বলে, রিয়েলী ভেরি আনফরচুনেট!

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিসেস চৌধুরী একটু হেসে অনিলবাবুকে বললেন, এত কাল যে কথা কাউকে বলতে পারেননি, তা এই দুই বউকে বলে দিলেন?

—কী করব বলুন, এদের তো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ওরা দু'জনেও তো আমার কাছে কোন কিছু গোপনও করে না, মিথ্যেও বলে না।

—না, না, আপনি ঠিকই করেছেন। এদের দু'জনের চাইতে ভাল বন্ধু তো আপনার হতে পারে না।

কোয়েল হাসতে হাসতে বলে, জানেন দিদা, আমাদের তিনজনের একটা আলাদা জগত আছে। সেখানে আমাদের মা-বাবারও নো অ্যাডমিশন!

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের ঐ তিনজনের জগতে একটু ঠাঁই পাবো না?

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে ; আপনাকে ঠাঁই না দিলে কী আপনি আমাদের এইরকম সিক্রেট মিটিং-এ থাকতে পারতেন?

যাইহোক দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকালে মিসেস চৌধুরীর ঘরে বসে দোয়েল-কোয়েল গল্পগুজব করছিল। হঠাৎ এ-কথা সে-কথার পর দোয়েল বলল, দিদা, কলকাতায় ফিরে যাবার পর

আমাদের ভুলে যাবেন না তো?

—না, দিদি, তোমাদের কাউকেই ভুলতে পারবো না।

মিসেস চৌধুরী একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, দিদি, এ সংসারে কিছু কিছু মানুষকে সারাজীবনই একা থাকতে হয়। আমি এইরকমই এক অভাগিনী। আমি কারুর বাড়িতেই বিশেষ যাই না।

—কিন্তু দিদা...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন, না, দিদি, আমাকে জোর করো না। আমি একা একা লুকিয়ে-চুরিয়ে চোখের জল ফেলেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।

উনি দু'হা'ত দিয়ে ওদের দু'জনকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তোমাদের সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যে আনন্দ পেলাম, তা সারাজীবনেও পাইনি। তোমাদের কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

পরের দিন সকালে দাদুনকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে দোয়েল-কোয়েলের সঙ্গে ওদের এক বন্ধু ও তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা। ঐ বন্ধু জোর করে দোয়েল-কোয়েলকে ওদের হোটেলে নিয়ে গেল। বলল, সন্ধের আগেই ফিরে আসবে।

বিকেলবেলায় চা খেয়ে অনিলবাবু বারান্দায় বসে ছিলেন নাতনীদের পথ চেয়ে। হঠাৎ মিসেস চৌধুরী হাজির।

অনিলবাবু মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, বেড়াতে বেরুচ্ছেন?

—আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

—আজই?

—হ্যাঁ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই হঠাৎ নীচু হয়ে অনিলবাবুকে প্রণাম করেই ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমাকে চিনতে পারলে না?

অনিলবাবু অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, না, ঠিক...

—আমি শিউলি।

—তুমি, শিউলি?

—হ্যাঁ।

মিসেস চৌধুরী আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
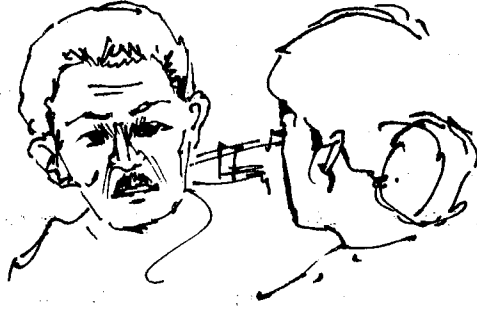
মর্গ

অত-শত চিন্তা-ভাবনা না করেই একেবারে শেষ দিন শেষ মুহূর্তে জমা দিলেও সে টেন্ডার যে উনিই পাবেন, তা বলাইবাবু ভাবতে পারেননি। বার বার মনে হয়, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই কী কাজ শেষ করতে পারবেন?

পি-ডবলিউ-ডি অফিস থেকে প্ল্যানের কাগজপত্র ব্যাগে পুরেই বলাইবাবু মোটর সাইকেল হাকিয়ে সোজা গিরির বাড়ি হাজির।

ওকে দেখেই গিরি লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এগিয়ে যায়। বলে, কোন কম্মোচারী না পাঠিয়ে একেবারে নিজে ছুটে এলেন?

বলাইবাবু ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, দুম করে টেন্ডার জমা দিয়ে এখন চিন্তায় পড়েছি।

—কেন? কীসের চিন্তা?

—কাজটা আমিই পেয়েছি কিন্তু হাতে সময় খুবই কম।

—শুনি কাজটা কী?

কন্ট্রাক্টর বলাইবাবু একটু ম্লান হেসে বলেন, আগেকার কাল তো নেই। এখন তো এদিকে খুনোখুনি লেগেই আছে।...

—ও কথা আর বলবেন না বাবু! পার্টিবাজির ঠেলায় তো আমার খুড়োর ছেলেটাই শেষ হয়ে গেল। এখন কখন যে কি হয়, তা বোধহয় ভগবানও জানেন না।

গিরি কোনমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, কাজটা কী, তা তো বল্লেন না।

—মর্গ! নতুন মর্গ তৈরি...

—মর্গ!

গিরি যেন আঁতকে ওঠে।

বলাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলেন, ওরে গিরি, আমরা হচ্ছি মিস্তিরী। আমাদের কাছে মন্দির-মসজিদও যা, মর্গও তাই।

এবার গিরিও একটু হেসে বলে, তা যা বলেছেন বাবু।

গিরির বড় ছেলে লক্ষ্মণ একটা মোড়া সামনে রেখে বলে, বাবু, বসে বসে কথা বলেন।

বলাইবাবু মোড়ায় বসতে না বসতেই ও চায়ের গেলাস সামনে ধরে বলে, বাবু, চা খেতে খেতে কথা বলেন।

উনি চায়ের গেলাস হাতে নিয়েই বলেন, হ্যারে লক্ষ্মণ, এবার ধান কেমন হবে মনে হচ্ছে?

—মনে তো হচ্ছে ভালই হবে।

—তবে আর চিন্তা কী?

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, না আচালে বিশ্বাস নেই।

—তার মানে?

—চারদিকের যা অবস্থা! ও ধান কার ঘরে উঠবে, তা কে জানে।

বলাইবাবু চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও মুখ তুলে বলেন, তা যা বলেছিস! এখন আমার টাকা তুই কেড়ে নিচ্ছিস, তোর ধান আমি কেটে নিচ্ছি।

গিরি এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, বলেন বাবু, এসব অশান্তি কোন কালে আমাদের দেশে ছিল? ক'বছরের মধ্যে সব উল্টে-পাল্টে গেল।

—সত্যিই তাই।

বলাইবাবু হাতের ঘড়ির দিকে একবার দেখে নিয়েই বলেন, গিরি, এবার কাজের কথা সেরে নিই। আমাকে এখনই মালপত্তরের ব্যবস্থা করতে ছুটতে হবে।

—হ্যাঁ, বাবু, বলেন।

কন্ট্রাক্টরবাবু চায়ের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে খালি গেলাসটা নীচে রেখেই ব্যাগ থেকে প্ল্যান বের করে ওর সামনে ধরতেই গিরি বলে, মাত্তর একখানা ঘর!

—এক খানা ঘর হলে কি হয়, এ ঘরে পাখা থাকবে না ; ঠাণ্ডা মেসিন বসবে। তাছাড়া...

—ও যা বসে বসুক। এরজন্য আবার চিন্তা কী?

—হাতে মাত্র বিয়াল্লিশ দিন সময়!

উনি একটু থেমে বলেন, সামনের মাসের পনেরই মন্ত্রী এটার উদ্বোধন করবেন।

—মড়া রাখার ঘরের ফিতে কাটতে মিনিষ্টার আসবেন!

গিরি হাসতে হাসতে বলে, বেঁচে থাকলে আরো কত দেখব!

—ওসব নিয়ে আমাদের ভেবে কী লাভ? কাজটা করে আমরা সবাই দুটো পয়সা পেলেই হলো।

—তা যা বলেছেন।

—শোন গিরি, বিষ্টি-বাদল শুরু হয়ে গেছে। কখন যে বিষ্টির জন্য কাজ বন্ধ রাখতে হবে, তার ঠিক নেই। তাই...

—বলছি তো আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না। আজ পর্যন্ত কোন কাজটা ঠিক সময় শেষ করতে পারিনি, আপনিই বলেন।

বলাইবাবু এক গাল হেসে বলেন, তোকে কী আমি শুধু শুধু ভালবাসি?

উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে একশ' টাকার পাঁচ খানা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন, তুই এখনই তোর লোকজনদের বলতে যা। কাল সকাল থেকেই মাটি কাটা শুরু করতে হবে।

গিরি মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

—আমি আর ওভারসিয়ারবাবু পুরনো মর্গের পাশে ন'টার আগেই পৌঁছে যাবো।

—আমরাও পৌঁছে যাবো।

এবার বলাইবাবু ব্যাগ থেকে একশ' টাকার একটা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে চাপা হাসি হেসে বলেন, পঞ্চাশ টাকার মাছ-মাংস কিনবি আর পঞ্চাশ টাকার একটা পাইট কিনবি।

গিরি শুধু হাসে।

বলাইবাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটু চাপা গলায় বলেন, আজ রাত্তিরটা আর পদ্মার ওখানে থাকিস না।

ও হাসি চেপে বলে, আপনি যান। কাল ঠিক সময় হাজির হবো।

মাপ-জোখ করে নিশানা দেওয়াই ছিল। তাই বলাইবাবু ওভারসিয়ারবাবুকে মোটর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে পৌনে ন'টা নাগাদ পুরনো মর্গের পাশে পৌঁছতেই দেখেন, গিরি তার দলবল নিয়ে হাজির।

উনি কিছু বলার আগেই ওভারসিয়ারবাবু বলেন, গিরি, কেমন আছিস?

—আজ্ঞে আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় ভালই আছি।

—এদিকে আয় ; তোকে দেখিয়ে দিই।

গিরি দু'তিনজন সাগরেদ নিয়ে প্ল্যানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে জমির দাগগুলো বুঝে নিয়েই বলে, ঠিক আছে। তবে আপনি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

—মাঝে মাঝে না, আমি রোজই একবার চক্কর দিয়ে যাবো।

ওভারসিয়ারবাবু সঙ্গে সঙ্গেই চলে যান।

উনি চলে যাবার পরই বলাইবাবু বলেন, গিরি, জয় মা-কালী বলে কাজ শুরু করে দে।

—তা দিচ্ছি কিন্তু দু'দিনেই মাটি খোড়ার কাজ শেষ হবে। কালই যেন ইট-সিমেন্ট-বালি...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কন্ট্রাকটরবাবু বলেন, আজই দু'তিন লরী ইট এসে যাবে। সিমেন্ট-বালি কাল দিতে বলেছি।

উনি একটু থেমে বলেন, কাল থেকে কেষ্ট এখানে থাকবে। হঠাৎ কিছু দরকার পড়লে ওকে বলে দিবি। তাছাড়া আমি তো দিনের মধ্যে দু'তিনবার চক্কর দেবই।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—তাহলে আমি এখন যাচ্ছি। বিকেলের দিকে একবার নিশ্চয়ই আসব।

মোটর সাইকেলে চেপে একটু যেতে না যেতেই ওর কানে আসে-বড় চাচা কী জয়!

দশ-পনের জন মেয়ে-পুরুষ বলে, জয়!

বলাইবাবু বুঝলেন, মাটিতে কোদাল পড়ল। আর চিন্তা নেই। গিরি ঠিক সময় কাজ শেষ করবে।

সত্যি গিরির মত মিস্তিরী এ শহরে তো দূরের কথা, কলকাতাতেও খুব বেশি আছে বলে অনেকেই মনে করেন না। দু'একটা বছর না, দীর্ঘ আঠারো বছর ও জয়নুদ্দীনের সঙ্গে কাজ করেছে। জয়নুদ্দীন কি যা তা মিস্তিরী ছিল? ও কত সময় পি-ডবলিউ-ডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের পর্যন্ত বলতো, সাহেব, আপনাদের ড্রয়িং মত কাজ করলে হাইওয়ের উপর এত লম্বা-চওড়া কালভার্ট এক বর্ষাতেই ভেঙ্গে পড়বে।

ও সঙ্গে সঙ্গে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে বলতো, এই মাটি কী ওটা ধরে রাখতে পারে?

কোন ইঞ্জিনিয়ার ওর কথা মেনে নিতেন, কেউ মানতেন না। দুটো-একটা বাড়িঘর কালভার্ট বা ছোট-খাটো ব্রীজ ভেঙে পড়ার পর আস্তে আস্তে রটে যায় জয়নুদ্দীনের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওর পরামর্শ না শুনলে পরে বিপদে পড়তে হবে। গিরিকে কেউ উল্টোপাল্টা কাজ করতে বললেই ও বলে, দ্যাখেন বাবু, আমি বড় চাচা

জয়নুদ্দীন মিয়ার কাছে কাজ শিখেছি। ঐ লোকটা দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তো। জীবনে সে মিথ্য কথা বলেনি, কাউকে এক পয়সাও ঠকায়নি। যে কাজ টিকতে পারে না, তা আমার দ্বারা হবে না।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বেইমানী বা আজেবাজে কাজ করলে বড় চাচা কবরে শুয়ে শুয়েও আমাকে ক্ষমা করবে না। ভুলে যাবেন না, এ শহরে যে সরকারী আর প্রাইভেট বাড়িঘর বড় চাচার হাতে তৈরি, সেগুলো পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছরেও কিছু হয়নি।

এখন তো গিরিই এ শহরের বড় চাচা। ওর দলের মেয়েপুরুষরা তাকে সাক্ষাৎ দেবতার মত ভক্তি করে ; শহরের লোকজনও যথেষ্ট মান্যগণ্য করে। জয়নুদ্দীন মারা যাবার পর থেকেই ও শুধু বলাইবাবুর কাজ করে। অন্য কোন ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে কাজ করা ওর পোষায় না।

না পোষাবার কারণও আছে। ও যখন যে টাকা চাইবে, ঠিকাদারকে তা দিতেই হবে। কাজ শুরু করার আগের দিন ও যেমন হাফ বোতল হুইস্কী খাবে, সেইরকমই পেট পুরে মাছ বা মাংস দিয়ে এক থালা ভাত খাবে। কাজ চলার সময় ঠিক উল্টো ব্যবস্থা। দু'বেলা শুকনো রুটি-তরকারী খাবে। সন্ধের পর এক-আধ গেলাসের বেশি মদও খাবে না। কাজ শেষ হবার দিন গিরি ওর দলের মেয়েপুরুষগুলোকে নিয়ে যেমন আকণ্ঠ মদ খাবে, সেইরকমই রাক্ষসের মত মাংস-ভাত খাবে। সেদিন যে কোন মেয়েটার উপর ওর চোখ পড়বে, তা কেউ জানে না।

এসব ক'জন ঠিকাদার বরদাস্ত করবে? বলাইবাবু বলেন, যে গরু দুধ দেয়, তার চাটি খেতে আপত্তি করব কেন?

গিরির স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কেউ কিছু বললেই ওর স্ত্রী জবাব দেয়, চাঁদে কলঙ্ক নেই? তাছাড়া ক'টা পুরুষের চরিত্তির ভাল বলতে পারো? আর পাঁচজনের মত আমার স্বামী ডুবে ডুবে জল খায় না।

ও একটু থেমে বলে, আমার স্বামী আমাকে আর আমার ছেলেদের যে রকম সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে, তা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ও আমাদের যে জমিজমা ঘরবাড়ি করেছে, তাই বা ক'জন পারে?

সব শেষে ও একটু হেসে বলে, যে লোকটা উদয়-অস্ত গতর খাটিয়ে মুঠো মুঠো টাকা আয় করে, সে যদি নিজের সখ-আনন্দের জন্য কিছু ব্যয় করে, তাতে আপত্তির কী আছে?

একথা সবাই স্বীকার করেন, গিরির মত মিস্তিরী হয় না। ও তো বলাইবাবুর সঙ্গে কাজ করার আগেই সোজাসুজি বলে দেয়, বাবু, একটা কথা সাফ্ জানিয়ে

দিচ্ছি। আমি বড় মিঁয়ার মতই বাঘের বাচ্চা। কোন আজেবাজে মালমশলা দিলে আমার দ্বারা কাজ হবে না। আপনিও বেইমানী করবেন না, আমিও বেইমানী করতে পারব না।

সত্যি কথা বলতে কি, গিরির জন্যই ঠিকাদারীতে বলাইবাবুর এত সুনাম ও শ্রীবৃদ্ধি। গিরি যেমন ওর কোন কথা ফেলতে পারে না, বলাইবাবুও ওকে আর ওর পরিবারকে দেখাশুনার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেন না। বছর দশেক আগেকার কথা। পেপার মিলের অফিস-গুদাম তৈরি করার সময় সরকারদের পুরনো বাগানবাড়ি ভাঙা হলো। ঐ পুরনো বাড়ির ইট-কাঠ দরজা-জানালাগুলো যে এত ভাল থাকবে, তা মিলের মালিকরা ভাবতে পারেননি। তাইতো ওরা বলাইবাবুকে বলেছিলেন, পুরনো বাড়ির ইট-কাঠ দিয়ে তো আমাদের কোন কাজ হবে না। ওগুলো যদি আপনার কোন কাজে লাগে, তাহলে নিয়ে যাবেন। আমাদের কিছু দিতে হবে না। বলাইবাবু ওগুলো লরিবোঝাই করে গিরির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো দিয়ে তোর দুটো শোবার ঘর আর রান্নাঘর হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে অন্য মাল-মশলাও আমি দিয়ে দেব।

শুধু তাই না। পূজার সময় ঠিকাদারবাবু গিরির বাড়ির সবাইকে নতুন জামাকাপড় দেবার পর একদিন ওকে অফিসে ডেকে একটা প্যাকেট হাতে দিয়ে একটু হেসে বলেন, এই প্যাকেটটা তোর পদ্মরানীকে দিবি।

গিরি সলজ্জ হাসি হেসে বলে, আপনার দয়ায় আমি সব দিক সামলে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিচ্ছি।

যাইহোক মর্গ তৈরির কাজ বেশ ভালভাবেই এগুচ্ছে। স্বয়ং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেখতে এসে বলাইবাবুকে বললেন, আপনার গিরি করছে কি? এ তো দেখছি আর দিন দশেকের মধ্যেই কাজ শেষ করে দেবে।

বলাইবাবু দন্ত বিকশিত করে বলেন, সাধে কী আমি ঐ শ্বেত হস্তীটাকে পুষি?

ওর কথা শুনে এক্সিকিউটিভ সাহেব হেসে ওঠেন।

মাঝে মধ্যে বৃষ্টি-বাদল হলেও কাজ এগিয়ে চলে। ছাদ পিটুনি শুরু হতে না হতেই ভিতরে ইলেকট্রিকের কাজ শুরু হয়। মর্গের বাইরে আর চারপাশের পাঁচিল প্ল্যাস্টার করা শুরু করে দেয় গিরি। ঠিক সেই সময় একদিন বিকেলের দিকে শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। মিনিটে-মিনিটে এটা-ওটা ভেঙে পড়ার শব্দ আর প্রচণ্ড মেঘের ডাক। কাজকর্ম বন্ধ করে গিরি তার লোকজনদের নিয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে করে পালায়।

ঝড় থামল সন্ধে ঘুরে যাবার ঘণ্টাখানেক পর কিন্তু বৃষ্টির তেজ আরো বেড়ে গেল। বৃষ্টি থামল একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকে।

সকালে সারা সহরের সব মানুষের মুখেই এক কথা। এখানে এটা ভেঙেছে, ওখানে ওটা উড়েছে ; এ রাস্তার উপর বড় বড় শাল গাছ ভেঙে পড়েছে, ও রাস্তার উপর তিন-চারটে ইলেকট্রিকের পোল ভেঙে পড়েছে।

গিরি জানে, খুব ভালভাবে রোদ্দুর না উঠলে আর কাজ করা যাবে না। তাইতো দুপুরে খেয়েদেয়ে মহাসুখে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। তাছাড়া মেজাজটাও ভাল ছিল। লক্ষ্মণ ভোরবেলাতেই জমিজমাগুলো দেখে ত্রসে খবর দিয়েছে, না, ধানের কোন ক্ষতি হয়নি ; তবে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। একদিনের রোদ্দুর পেলেই আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।

সন্ধের মুখে হন্তদন্ত হয়ে বলাইবাবু এসে হাজির।

গিরি অবাক হয়ে বলে, বাবু, আপনি এখন?

ঠিকাদারবাবু এক গাল হেসে বলেন, কথায় বলে না, কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্বনাশ!

উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, কালকের ঝড়ে আমাদের যে কি উপকার হলো, তা তুই ভাবতে পারবি না।

—তার মানে?

উনি হাসতে হাসতেই বলে যান, শত খানেক বছরের বিশাল মেহগনী গাছ ভেঙে জেলখানার পাঁচিল পড়ে গেছে, এস-ডি-ও সাহেবের বাংলোর ছাদে একটা শাল গাছ পড়ে একটা ঘরের দারুণভাবে ক্ষতি হয়েছে, পুলিশ ব্যারাকের উপর ইলেকট্রিক পোল...

—তাই বুঝি হঠাৎ অনেক কাজ পেয়েছেন?

হাসতে হাসতেই গিরি জিজ্ঞেস করে।

—কাজের বন্যা এসে গেছে।

ঠিকাদারবাবু একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, পারলে আজ রাত্তির থেকেই জেলখানার কাজ শুরু করার দরকার। বলরাম আর দু'তিনজনকে মর্গের কাজ করতে বলে তুই অন্য সবাইকে নিয়ে আটটার মধ্যেই জেলখানার গেটের সামনে চলে আয়।

গিরি খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তার মানে আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

—হ্যাঁ, সে তো হবেই। তোকে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হবে না। একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়। খরচের জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

উনি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন, লক্ষ্মণ আর ওর মাকে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তুই এখন মাস তিনেক শুধু পাগলের মত কাজ করে যা।

ঠিকাদারবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একটু হেসে বলেন, এই তিন মাসেই আমরা সারা বছরের কামাই করে নেব।

হ্যাঁ, পরদিন থেকেই জেলখানার কাজ শুরু হয়। ঐ কাজের মাঝখানেই এস-ডি-ও সাহেবের বাংলোর কাজে হাত দিতে হয়। এসব কাজের মধ্যেই মর্গের কাজের তদারকী করে গিরিও নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পায় না। তবে জেলখানা আর মর্গের কাজ একই দিনে শেষ হতে গিরি ঠিকাদারবাবুকে বলল, বাবু, টাকা দেন। আজ আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া-স্ফূর্তি করবো।

—তার মানে কাল তো তোরা কেউ কাজে আসবি না।

—কাল তো মন্ত্রী মর্গের ফিতে কাটবেন। আপনারা সবাই তো সেখানে ব্যস্ত থাকবেন।

—তা ঠিক কিন্তু...

—কিছু চিন্তা করবেন না। আর দু'দিনেই এস-ডি-ও সাহেবের ঘর রং করাও হয়ে যাবে।

বলাইবাবুর হাত থেকে টাকা নিয়েই গিরি বেশ গলা চড়িয়েই বলে, ঠিকাদারবাবু কী...

ওর দলের মেয়েপুরুষরা এক সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, জয়।

সঙ্গে সঙ্গে গিরি বলে, এই ফুল্লরা, তোরা চার-পাঁচজনে তাড়াতাড়ি নকুলদের গোয়াল ঘরখানা সাফ-সুফ করে রেডি কর। ওখানেই আমাদের আসর বসবে।...ছোট মাসী, তুমি দু'একজনকে নিয়ে ঐ গোয়াল ঘরের পিছন দিয়েই উনুন-টুনুন ঠিক করো।

এবার ও পাশ ফিরে বলে, মানিক, এই টাকা দিয়ে তোরা ক'জনে চাল, তেল-মশলা আর মাংস কিনতে চলে যা। রিক্সা করে যাবি, রিক্সা করে আসবি। কিন্তু সাবধান, কোন কিছু যেন কম না পড়ে।

গিরি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে একটু হেসে বলে, আমি যাচ্ছি বিপিনবাবুর কারণসুধা আনতে।

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও হঠাৎ পিছন ফিরে কোমর দুলিয়ে বাঁকা চোখে গিরির দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে ফুল্লরা বলে, দেখো বড় চাচা, ওটা যেন কম পড়ে

না। কম পড়লে নাচ-গানের মেজাজই আসবে না।

গিরি একবার ওর ঢেউ খেলানো শরীরের উপর দিয়ে দুটো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ওরে হতভাগী, তুই জানিস না, তোর কোমর দুলানো দেখে এই ছোকরাগুলোর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে?

ও মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, সবাই কী আমার মত সাহসী মরদ হয় যে সবার সামনে তোকে কোলে তুলে নিয়ে শাল বনে চলে যাবে?

যাইহোক কেনাকাটা উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর শুরু হয় রান্নাবান্না। পুরনো দিনের গোয়াল ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চাটাই বিছিয়ে দিয়ে দু'কলসী জলও আনা হয়েছে। গিরি রেশন ব্যাগ ভর্তি মদের বোতল নিয়ে পৌঁছবার পর সব দেখেশুনে বলে, তোরা বেশ ওস্তাদ হয়েছিস। আমি মরে গেলে তো তোরাই এক একজন বড় চাচা হবি।

ফুল্লবার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে ফুলমনি চাপা হাসি হেসে বলে, বড় চাচা, দেশী মাল আনোনি তো?

—তোদের মত ডাগর-ডোগর ছুড়ীদের কী আমি দেশী খাওয়াতে পারি? তাছাড়া আমাদের ঠিকাদারবাবুও তো কেপ্পন না।

গিরি ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ঠোঙা বের করে ওকে দেখিয়ে বলে, দ্যাখ, দ্যাখ, তোর আর ফুল্লরার জন্য কাজু কিনেছি নিজের পয়সায়।

ফুল্লরা ঠোঁটের কোনে হাসি লুকিয়ে বলে, ফুলমনি, তোর পেয়ারের বড় চাচাকে বলে দে, মধু খেতে হলে শুধু কাজু কেন, দরকার হলে বাঘের দুধও খাওয়াতে হয়।

—আমরা বললে বড় চাচা তাও খাওয়াবে।

গিরি প্রথম বোতলটা খুলতে খুলতে বলে, দাঁড়া, পেটে একটু পড়তে দে। তারপর তোদের দুটোকে দেখাচ্ছি।

দেখতে দেখতে আসর জমে ওঠে। হাসি-ঠাট্টা নাচে-গানে মেতে ওঠে সবাই। গেলাস খালি হলেই আবার ভরে যাচ্ছে। হঠাৎ ছোট মাসী শালপাতার উপর কয়েক টুকরো মাংস এনে গিরির সামনে ধরে বলে, দেখো তো বড় চাচা, সব ঠিক আছে কিনা।

ও এক টুকরো মাংস মুখে দিয়েই বলে, একেবারে ফাস্ ক্লাস। তোমার হাতখানা সত্যি সোনা দিয়ে বাধানো।

গিরি মুখ তুলে একটু হেসে বলে, তোমার রান্না খাবার জন্যই সামনের জন্মে তোমার পেটে জন্মাতে হবে।

ছোট মাসী হাসতে হাসতে চলে যাবার একটু পরেই আবার বেশ খানিকটা মাংস

এনে ওর সামনে রেখে বলে, ঐ চানাচুর-ফানাচুর না খেয়ে মালের সঙ্গে এক এক টুকরো মুখে দাও।

—আমাকে এত মাংস দিলে তো তোমাদের কম পড়ে যাবে ।

—না, না, কম পড়বে না। আজ অনেক বেশি মাংস এসেছে।

আসর আরো জমে ওঠে। রাতও এগিয়ে চলে।

হঠাৎ ছোট মাসীকে পাশে দেখেই গিরি বলে, যদি রাগ না করো, তাহলে একটা কথা বলতাম।

—তোমার উপর আমরা কেউ কী রাগ করতে পারি?

ছোট মাসী এক নিঃশ্বাসেই বলে, তোমার জন্যই তো আমার খেয়ে-পরে হেসে-খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি।

—আজকের মাংস রান্না সত্যি দারুণ হয়েছে। আমার তো পেট ভরে গেছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে পদ্মর জন্য একটু মাংস...

ওকে কথাটা শেষ করতে হয় না। শুধু ছোট মাসী না, আরো দু'দিনজন এক সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাও।

ফুল্লরা বলে, মাসী, শুধু পদ্মর জন্য না, বড় চাচার জন্যও খানিকটা মাংস দিও।

—সে তো দেবই।

গিরি বলে, সত্যি আমার পেট ভরে গেছে। তাছাড়া বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি ওকে খেতে দিয়েই শুয়ে পড়ব।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কোনমতে পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে পদ্মর কাছে পৌঁছেই ওর মুখে এক টুকরো মাংস দিয়ে গিরি বলে, মাংস খেয়ে এত ভাল লাগল যে তোকে না খাইয়ে থাকতে পারলাম না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। শুতে গেলাম। তুই খেয়েদেয়েই চলে আয়।

বিছানায় শুতে না শুতেই গিরি নাক ডাকতে শুরু করে। পদ্ম কত কথা বলে, কত আদর করে, ও কিছুই শুনতে পায় না, জানতেও পারে না।

তারপর হঠাৎ শেষ রাত্তিরের দিকে চিৎকার-চেঁচামিচিতে ওদের দু'জনেরই ঘুম ভেঙে যায়। বার বার কানে আসে—শালারা আমাদের ধানে আগুন লাগাচ্ছে। শিগ্‌গির চলো। মারো। মারো শালাদের।

আবার কেউ পাগলের মত চিৎকার করে, শালারা আমাদের ভাতে মারলে আমরাও ওদের জানে মারব।

ব্যস! ওদের চিৎকার কানে যেতেই গিরি এক লাফে চৌকি থেকে নেমে পড়েই

ঘরের কোন থেকে বল্লমটা হাতে নিয়েই বাঘের মত ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে, আমার ছেলেটা বুকের রক্ত জল করে চাষ করেছে আর তোরা সেই ধান পুড়িয়ে দিবি। শালা, তোদের আজ আমি শেষ করে দেব।

ভূতের মত কালো চেহারার এক দল লোক তীর-ধনুক লাঠি-বল্লম ইট-পাথর হাতে নিয়ে অমাবস্যা রাতের শেষ প্রহরে ছুটে চলে ঐ মশাল হাতে লোকগুলোর দিকে।

তারপর দু'দিক থেকেই ঘন ঘন রণহুঙ্কারে কেঁপে ওঠে চারদিক। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় দু'দলের আক্রমণ।

ডান দিকের জমিগুলোর পাকা ধান দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই গিরি উন্মাদের মত চিৎকার করে, তবে রে শালা! দেখাচ্ছি তোদের মজা।

ওর হাত থেকে বল্লমটা নিশানার দিকে ছুটে যাবার মুহূর্তেই গুলির আওয়াজ, গুড়ুম! গুড়ুম!

তারপর?

নতুন এয়ার-কন্ডিশনড্ মর্গের উদ্বোধন করে মন্ত্রী মহা খুশি। অনুষ্ঠান শেষে অফিসারদের মোসাহেবীতে বিগলিত হয়ে মন্ত্রীমশাই সন্দেশ মুখে দিতে না দিতেই হাসপাতালের দু'জন কর্মচারী ট্রলিতে ডেড বডি নিয়ে হাজির।

গিরি জানতে পারল না, মর্গের উদ্বেধন মন্ত্রীমশাই না, ও করলো।

মর্গ তো ওদের মত মানুষদের জন্যই তৈরি হয় ; মন্ত্রী বা সাহেবসুবাদের জন্য না।

সার্কাসের বাঘ আর সুন্দরবনের বাঘ

তামাম বাংলা সিনেমা জগতে খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। শংকর সরকার দু'এক মাসের মধ্যেই নতুন ছবি শুরু করবেন। কোন পত্রিকার ছাপা হলো, কার্শিয়াং অঞ্চলের কোন এক বাংলোয় বসে চিত্রনাট্য রচনার কাজ প্রায় শেষ। আবার দু'তিনটি প্রভাতী দৈনিকে বেরুল, শংকরবাবু লোকেশন ঠিক করে কলকাতায় এসে কোন এক হোটেলে বসে শিল্পী নির্বাচন চূড়ান্ত করছেন। ইতিমধ্যে তিনটি গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে। আরো কত কি খবর বেরুল অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়।

অন্য পরিচালকদের চিন্তার শেষ নেই। কারণ উনি যে বিষয় নিয়ে ছবি করেছেন বা করবেন, সেই বিষয় নিয়ে আর ছবি করা যাবে না। দু'একজন প্রযোজক ও পরিচালক শংকরবাবুর ছবির বিষয় নিয়ে ছবি করে পুরো টাকাটাই জলে দিয়েছেন। এদিকে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেও চাপা উত্তেজনা। শংকরবাবুর ছবিতে সুযোগ পাওয়া মানে দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ। সর্বজন উপেক্ষিত চিৎপুর যাত্রা পাড়ার ধনঞ্জয় বৈদ্য তো শংকরবাবুর একটা ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেই বাংলা চলচ্চিত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। শুধু কী তাই? গ্রাম বাংলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতি সাধারণ শিক্ষয়িত্রী বলাকা রায় শংকরবাবুর মাত্র একটা ছবিতে অভিনয় করেই এখন বছরে পনের-কুড়িটি ছবির নায়িকা হচ্ছেন। বলাকা এখন আলিপুর রোডের বাসিন্দা। মারুতি এস্টিম বা সিলো চড়ে স্টুডিও আসেন।

সে যাইহোক, সবাই একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন, শংকর সরকারের কাহিনী

নির্বাচন, চিত্রনাট্য রচনা, লোকেশান পছন্দ করা, প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন ও সর্বোপরি পরিচালনা সত্যিই অভাবনীয়। এক ছোট্ট নগণ্য রেল স্টেশন বৃন্দাবনপুর দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র তিনটি প্যাসেঞ্জার গাড়ি যাতায়াত করে। মাত্র বিশ-পঁচিশজন যাত্রী ওঠা-নামা করে। এহেন স্টেশনের সামান্য স্টেশন মাস্টারকে নিয়ে উনি যে ছবি করেছেন, তা দেখে কে মুগ্ধ হয়নি? উনি কী শুধু শুধু বছর বছর দেশে-বিদেশে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হচ্ছেন?

শংকরবাবুর ছবিতে মানুষের কামনা-বাসনা-লালসা, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, হিংসা-দ্বেষ, অনাচার-অবিচার-ব্যাভিচার, মহত্ত্ব-হীনতা ও আরো কত কি থাকে। কিন্তু এমনই তাঁর কাহিনী নির্বাচন, চিত্রনাট্য রচনা ও সর্বোপরি পরিচালনায় মুন্সীয়ানা যে ফুলশয্যার রাতে নায়ক-নায়িকার উন্মত্ত উপভোগের দৃশ্য দেখেও কখনই অশ্লীল মনে হবে না। ছেলেমেয়েকে পাশে নিয়ে বাপ-মায়েরাও নির্বিবাদে সে ছবি দেখেন। ওর ছবির প্রতিটি দৃশ্যই এমন শিল্পমাধুর্য ময় যে পতিতাপল্লীর চূড়ান্ত ব্যভিচারের দৃশ্য দেখেও পতিতাপল্লীর মানুষগুলোর ব্যর্থ রিক্ত জীবনের জন্য লোকে চোখের জল ফেলতে বাধ্য হন।

তপন পাল নায়ক হিসেবে প্রথম আর্বিভাবেই বাঙ্গালী দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তারপরও দু'চারটি ছবিতে ভালই অভিনয় করলেও অন্যান্য ছবিতে অভিনয় দেখে দর্শকরা মোটেও খুশি হতে পারেনি। সেই একই ধরণের ন্যাকামী, নায়িকাকে নিয়ে কিছু জড়াজড়ি ও নাচ-গান আর একটু-আধটু মারামারির শেষে হয় চোখের জল, না হয় যদিদং হৃদয়ং মম... মন্ত্রোচ্চারণের দৃশ্য। বছরের পর বছর এই একই ধরণের অভিনয় করার জন্য যখন অধিকাংশ দর্শক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না, ঠিক তখনই মুক্তিলাভ করল শংকর সরকারের 'অচেনা শহর'। নায়ক? সেই সর্বজন উপেক্ষিত তপন পাল।

ছবিটি মুক্তিলাভ করার আগে অনেক অভিজ্ঞ চিত্র সমালোচকও লিখেছিলেন, শংকর সরকারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায়, যে ছবির নায়ক তপন পাল, সে ছবি বাঙ্গালী দর্শকদের খুশি না করার সম্ভাবনাই বেশি। নন্দনের চত্বরে বসে আড্ডা দিতে দিতে বুদ্ধিজীবি চিত্রমোদিরাও টিপ্পনী কেটেছেন, এই ছবি থেকেই শংকরবাবুর বিগিনিং অব হিজ এন্ড হতে বাধ্য।

ছবিটি যথারীতি মুক্তিলাভ করল মিনার-বিজলী-ছবিঘরে। প্রথম দিন ম্যাটিনী-ইভনিং হাউসফুল হলেও রাত্রের শো'তে শত খানেক করেও টিকিট বিক্রি হলো না। দুঃশ্চিন্তায় তিন পেগের জায়গায় ছ'পেগ হুইস্কী খেয়েও সে রাত্রে তপন পালের ঘুম

এলো না। ঘুম এলো একেবারে ভোরের দিকে চারটে-সাড়ে চারটে নাগাদ।

স্ত্রী লোপামুদ্রা ভোরবেলায় বাথরুম থেকে বেরিয়েই অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বনমালীকে বললেন, দাদাকে চা দিতে হবে না, ডাকতেও হবে না।

বনমালী বহুদিন ধরেই এ বাড়িতে কাজ করছে। ও খুব ভাল করেই জানে, যে ছবির রিপোর্ট খুব খারাপ হয়, সে সময় বেশ ক'দিন বাড়ির পরিবেশ এমনিই থম থমে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়।

আকাশ-পাতাল চিন্তা-ভাবনা করতেই করতেই লোপামুদ্রা মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। হঠাৎ বেল বাজতেই চমকে ওঠে। বিরক্তও হয়। একটু পরেই বনমালী এসে বলে, বৌদি. তিনটি মেয়ে ফুল-টুল নিয়ে এসেছে। দাদার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা উৎসাহ না থাকলেও লোপমুদ্রা দরজার কাছে যেতেই তিনটি মেয়েই এক গাল হাসি হেসে প্রায় একই সঙ্গে বলে, আপনিই তো বৌদি?

—হ্যাঁ।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে টিপ টিপ করে ওকে প্রণাম করে।

লোপমুদ্রা অবাক হয়ে বলে, আমাকে কেন প্রণাম করছো?

একটি মেয়ে বলে, আপনার মত স্ত্রী পেয়েছেন বলেই তো দাদা এত অসাধারণ অভিনয় করতে পেরেছেন।

অন্য একটি মেয়ে বলে, পুরো ছবিটা দেখতে দেখতে দাদার উপর যেমন রাগ হচ্ছিল, সেইরকমই ঘেন্না করছিল কিন্তু শেষ পাঁচ মিনিট দাদার জন্য সবাই হাউ হাউ করে কেঁদেছে।

তৃতীয় মেয়েটি বলল, কাল হল থেকে বেরিয়েই আবার আমরা আজকের টিকিট কেটেছি।

প্রায় ঝড়ের বেগে ওরা তিনজন কথাগুলো বলার পরই লোপামুদ্রা বলে, তোমরা এতদিন পর 'সাগর পারে' দেখলে?

—না, না, আমরা 'অচেনা শহর' এর কথা বলছি।

—ছবিটা সত্যি তোমাদের ভাল লেগেছে?

—অসাধারণ!

—সুপার্ব!

পর পর দু'জনের মন্তব্যের পর তৃতীয় মেয়েটি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমার মনে হয়, এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য দাদা যে সম্মান পাবেন, তা বোধহয় আর কোন অভিনেতার ভাগ্যে জোটেনি।

এতক্ষণে লোপামুদ্রার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, তোমরা ভিতরে এসো।

ওদের ড্রইং রুমে বসিয়েই লোপামুদ্রা স্বামীকে ডেকে আনে। মেয়েরা তপনের হাতে ফুলের তোড়া আর মিষ্টির বাক্স তুলে দিয়েই প্রণাম করে।

—দাদা, এই একটি ছবির জন্যই কেউ আপনাকে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

—আমার কথা শুনুন দাদা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এই ছবির জন্য আপনি যে সম্মান পাবেন, তা আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

—ওরা ঠিকই বলছে ; তবে একটা কথা জেনে রাখুন, ছবির নব্বই ভাগ দেখে আপনার উপর যেমন রাগ তেমনি ঘৃণা হলেও শেষে সবাই আপনার জন্য চোখের জল ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

তপন খুশি হয়ে বলে, তোমাদের কথা শুনে ভালই লাগছে কিন্তু কোন ছবি শুধু কিছু মানুষের ভাল লাগলেই তো...

ঠিক সেই সময় বনমালী টেলিফোন রিসিভার ওর সামনে ধরে বলল, এক ভদ্রলোক গ্রান্ড হোটেল থেকে ফোন করছেন।

তপন রিসিভার হাতে নিয়েই বলে, হ্যালো!...ইয়েস, আয়াম তপন পাল!

এক মিনিট পরই ও এক গাল হাসি হেসে বলল, অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু আমার অভিনয় কী সত্যি এত ভাল হয়েছে?

আবার একটু নীরবতার পর বলে, কলকাতা এলেই ফোন করবেন।

টেলিফোন পাশে রেখে তপন লোপামুদ্রার দিকে তাকিয়ে বলে, বোম্বের যশলোক হাসপাতালের ডাঃ রায় ভাইঝির বিয়েতে দু'দিনের জন্য এখানে এসে কাল 'অচেনা শহর' দেখে খুব ভাল লেগেছে বললেন।

ওর ঠিক পাশে বসা মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, ভাল লাগবেই তো! এই ছবিতে আপনার অভিনয় দেখে যার ভাল লাগবে না, সে হয় বোকা, না হয় পাগল।

ওর কথা শুনে তপন হেসে ওঠে। তারপর বলে, তোমাদের নাম তো বললে না?

—আমি শ্রীময়ী।

—আমি কাবেরী।

—আমি চৈতালী। আমরা তিনজনেই এক সঙ্গে কলেজে বি. এ. পড়ছি।

আবার টেলিফোন।

এবার স্বয়ং প্রয়োজক। উনি খুশির হাসি চেপে রেখে বলেন, এই তপু, শুনে তুই খুশি হবি, এই সাত সকালেই তিনটে হলেই টিকিটের জন্য প্রচুর লোক লাইন দিয়েছে। নৈহাটি সিনেমায় কাল ম্যাটিনী শো'তে বিশেষ ভীড় না হলেও পরের দুটো

শো হাউস ফুল হয়েছে।

—হ্যাঁ। সত্যি ভাল খবর।

—এখন তো সবে কলির সন্ধে। দ্যাখ না এর পর কী হয়!

সত্যি এর পর যা হলো, তা শুধু তপনের না, অনেকেরই স্বপ্নাতীত ছিল। এই আলোকজ্জ্বল মহানগরীর অন্ধকার জগতের এক দল ভাগ্যহীনা পতিতাদের জীবন কাহিনী নিয়ে শংকর সরকারের এই ছবি তিন মাস ধরে হাউস ফুল যাবে, তা বহুজনেরই কল্পনাতীত ছিল। তপন পাল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা শুনেই কলকাতার সাংবাদিকরা হাজির হয়েছিলেন। সবারই এক প্রশ্ন: আপনি এইরকম অসাধারণ অভিনয় করলেন কী করে?

—গুরুর কৃপায় যেমন দিশাহারা নরেন দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, আমিও সেইরকম শংকরদার কৃপায় এইরকম অভিনয় করেছি।

হঠাৎ তপনের মুখে এই অসাধারণ মন্তব্য শুনে সাংবাদিকরা মুগ্ধ হয়ে আর কো প্রশ্ন করেননি কিন্তু বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অচেনা শহর' শ্রেষ্ঠ ছবি ও তপন পাল সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাবার পর সারা দুনিয়ার সাংবাদিকরা অত সহজে ওকে ছেড়ে দেয়নি।

বেশ কয়েকজন আমেরিকান ও জার্মান সাংবাদিক তো সোজাসুজি ওকে বললেন, আপনি তো থার্ড ক্লাস বেঙ্গলী ফিল্মের হিরো হতেই অভ্যস্থ। তাহলে এইরকম অসাধারণ অভিনয় করলেন কী করে?

—ফাঁকি দিয়ে উত্তর দেবেন না।

মন্তব্য করলেন এক ফরাসী সাংবাদিক।

এক তরুণী ইংরেজ সাংবাদিক হাসতে হাসতে বললেন, আপনার উত্তরে আমরা খুশি না হওয়া পর্যন্ত আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না।

না, তপন পাল ফাঁকি দেয় নি। বলেছিল, এই ছবিটি করার আগে আমি একশ' পঁচিশটি ছবিতে নায়ক হয়েছি। সুতরাং আমার চেহারা বা মুখ শংকর সরকারের মোটেও অচেনা বা অজানা ছিল না। তবু আমার সঙ্গে চুক্তি করার আগে উনি আমাকে নিয়ে তিন দিন কলকাতার এক হোটেলে থেকে দিনরাত্তির শুধু হা করে আমাকে দেখেছেন।

—হোয়াই?

—তখন বুঝিনি কিন্তু পরে বুঝেছি?

ও একটু থেমে বলে, ছবিটার শতকরা নব্বই অংশে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে মনুষ্যত্বহীন হৃদয়হীন নীচ হীন অর্থপিশাচ ও চরিত্রহীন হিসেবে। ছবির

শেষাংশে আমাকে ঠিক বিপরীত মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন। তিন দিন ধরে আমাকে দেখতে দেখতে উনি বুঝতে পারেন, মুখের কোন দিকের ছবিতে আমাকে কখনও ভাল, কখনও মন্দ দেখানো যাবে।

—ইয়েস, নাউ উই আন্ডারষ্ট্যান্ড।

ইংরেজ তরুণী প্রশ্ন করেন, আই এগ্রি ওর ক্যামেরা ওয়ার্ক সত্যি বিস্ময়কর কিন্তু শুধু ক্যামেরার খেলা দেখিয়ে এইরকম একটা অসামান্য ছবি তৈরি করা যায় না।

—দ্যাটস রাইট।

প্রখ্যাত অভিনেতা তপন পাল একটু হেসে বলে, তিরিশ-চল্লিশ বা ষাট-সত্তরতলা বাড়ি তখনই সুন্দর ও মজবুত হবে, যখন সেই গগনচুম্বী অট্টালিকার আর্কিটেক্ট প্রয়োজন, সৌন্দর্য, বাস্তবতা ও স্থায়িত্বর বিষয় চিন্তা করে পরিকল্পনাটি তৈরি করবেন। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার এই কাজটি করেন।

—ইয়েস উই নো দ্যাট।

—মিঃ সরকার এই কাজটি এত নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে করেন যে তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা অর্জন করে।

—হোয়াট মোর।

—এর পর আছে মোটিভেশন। উনি ছবির প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তার চরিত্র সম্পর্কে এমনভাবে বুঝিয়ে অনুপ্রাণিত করেন, তারা ঠিক চরিত্র অনুযায়ী মানসিকভাবে বদলে যেতে বাধ্য হয়। দেন কামস রিহার্সাল!

—আই সী!

—কাউকে দু'দিন-তিন দিন ধরে, কাউকে আবার মাস খানেকের বেশি সময় ধরে রিহার্সাল দেন। তার পর পরই এক নাগাড়ে তিন থেকে চার সপ্তাহ ধরে সুটিং চলার সময় এমন স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ হয় যে তা এক কথায় অভাবনীয়।

এবার তপন পাল একটু হেসে বলে, ক্যান ইউ বিলিভ এই ছবির জন্য আমাকে ও নায়িকা শর্মিষ্ঠাকে শুধু হোটেলের দুটি ঘরেই রেখে দেন নি, ঘর দুটিকে জঘন্য পতিতা পল্লীর ঘরের মত অসংখ্য অশ্লীল ছবি ও কুরুচিপূর্ণ জামাকাপড়-চাদর-পর্দা দিয়ে সাজানো ছিল।

তরুণী সাংবাদিকটি লাফ দিয়ে উঠে বলে, ও মাই গড!

তপন প্রেস সেন্টারের কনফারেন্স রুম থেকে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে, এমন সার্থক পরিকল্পনা, দরদ, নিষ্ঠা ও মুন্সীয়ানার সঙ্গে শংকর সরকার ছবি করেন বলেই তো ভারতের পূর্ব প্রান্তের একটি রাজ্য থেকে এসেও উনি বার্লিন জয় করতে পেরেছেন ও আপনারা সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আয়াম গ্রেটফুল টু অল অব ইউ ফর দ্যাট।

তপন বেরুতে চাইলেই কী বেরুতে পারে? প্রত্যেকে তার সঙ্গে করমর্দন করেন। যেসব ফটোগ্রাফাররা তখনও ছিল, তারা ওর ছবি তোলে।

শুধু কী তাই?

পনের-কুড়িজন মহিলা সাংবাদিক ওর গালে চুম্বন পর্যন্ত করলেন।

যে তরুণী সাংবাদিক ওকে বার বার প্রশ্ন করেছে, সে ওর গালে চুম্বন করেই ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, টোপন, প্লীজ কাম টু লণ্ডন অ্যান্ড বী মাই গেষ্ট।

তপন এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, সামনের সপ্তাহেই লণ্ডন আসছি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে যদি কলকাতার কাগজে বেশ মজার স্টোরি ছাপা হয়, তাহলে...

—টোপন, ডোন্ট বী সিলি! লণ্ডনে কে কার সঙ্গে থাকে, তার খবর কেউ রাখে না।

ও একটু হেসে বলে, তাছাড়া তোমার মত বিখ্যাত অভিনেতা ত যুবতীদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বলে জানি না।...

তপন হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

পরে কেম্পিনিস্কি হোটেলে ফিরে শংকরবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই উনি একটু হেসে বলেন, তপু, তুই ত বেশ অভিজ্ঞ ডিপ্লোম্যাটদের মত জার্নালিষ্টদের সুন্দর হ্যান্ডেল করলি।

—আপনি কী করে জানলেন।

—তোর প্রেস কনফারেন্স ত লোকাল টি. ভি. ষ্টেশন কভার করছিল। তাই...

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও শংকরবাবুর দুটি হাত ধরে বলে, এই আত্মবিশ্বাস বা পটাপট প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার আগে ছিল না। এই আত্মবিশ্বাস ও কথা বলার ক্ষমতাও আপনার কৃপায় হয়েছে।

—তোর মধ্যে এইসব ক্ষমতা না থাকলে কী আজ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করতো?

উনি একটু থেমে বলেন, গুরুজন ও শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে, তাদের স্নেহভাজন প্রিয় পাত্র ছাত্রছাত্রীদের লুকিয়ে থাকা, চাপা পড়া গুণ বা ক্ষমতাগুলোর প্রকাশে সাহায্য করা।

তপন নীরবে ওর কথা শোনে।

শংকরবাবু হাসতে হাসতে বলেন, ছবি করার সময় আমি তোদের ছাত্রছাত্রী মনে

করে মাত্র কয়েক মাসের জন্য গুরুগিরি করি। তার বেশি কিছু না।

—তাতেই ত আমাদের চিন্তা-ভাবনা বা কাজ করার ক্ষমতা একেবারে বদলে যাচ্ছে। আমাকে দিয়ে যে আপনি এভাবে কাজ করিয়ে নেবেন, তা ভাবতেই পারিনি।

ও একটু থেমে বলে, সুটিং-এর সময় আপনি কোন জার্নালিষ্ট বা আউট সাইডারকে ফ্লোরে ঢুকতে না দিলেও আমাদের এই ছবির কাজ চলার সময় নানা কাগজে টুকটাক রিপোর্ট হরদম বেরিয়েছে। যে শর্মিষ্ঠা মাত্র একটা মাইথোলজিক্যাল ছবিতে অত্যন্ত বাজে অভিনয় করেছে, তাকে আপনি শুধু নায়িকা না, এক জঘন্য পতিতার চরিত্রে নামিয়েছেন বলে...

—ওসব কথা, ওসব রিপোর্ট ভুলে যেতে হয়।

তপন একটু হেসে বলে, সত্যি বলছি শংকরদা, আমি এত ছবিতে অভিনয় করার পরও বলছি, শর্মিষ্ঠার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

—হ্যাঁ, ও ভালই কাজ করেছে।

টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার এক দল প্রযোজক পরিচালক মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে খুব ভাল করেই জানেন, শংকর সরকার এক মুঠো ধুলো হাতে নিলেও তা সোনা হয়ে যায়। যেসব পরিচালকদের ছবি শুধু কলকাতার এক দল সাংবাদিক আর কয়েক শ' তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও নব নন্দন চত্বরের প্রেমিক-প্রেমিকারা দেখার পর দু'একটা চলচ্চিত্র উৎসবে যায় কিন্তু কখনই লক্ষ লক্ষ দর্শকদের দেখাতে সাহস করে না, তারা ত শংকর সরকারকে শুধু বিদ্বেষ না, তাচ্ছিল্যও করেন। কিন্তু মজার কথা, শংকরবাবুর ছবির শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই না, তাঁর ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি কর্মী ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করে।

এর অনেক কারণ আছে।

শংকরবাবু কোন আর্টিষ্টকেই গাড়ি করে স্টুডিও আনেনও না, বাড়ি পৌঁছেও দেন না। উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতা থেকে দুটি বাসে ইউনিটের অন্যান্যদের সঙ্গে ছবির কাজ করার জন্য ওদের আসা-যাওয়া করতে হয়। লাঞ্চে সবাইকেই একই খাবার একই সঙ্গে খেতে হয়। দূরে কোথাও আউট ডোরে যেতে হলে পুরো একটা সেকেন্ড ক্লাস শ্লিপার কোচ রিজার্ভ করে সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে যান। চুক্তি পত্রে সবাইকেই এইসব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে বলে সই করিয়ে নেওয়া হয়।

এই বিধিব্যবস্থার জন্য অনেকেই অনেক রকম টিকা-টিপ্পনী কাটলেও শংকরবাবুর ছবির সমস্ত শিল্পী ও কর্মীদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়, তা অন্যদের কল্পনাতীত। এরা সবাই মন-প্রাণ দিয়ে কাজ না করলে কী ওর

ছবি এত নিখুঁত হয়?

শুধু ছবির কাজে না, পরিবারিক জীবনকেও একই রকম সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্যও উনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না। মা-বাবার শত অনুরোধ সত্ত্বেও ছোট তিন বোনের বিয়ের আগে উনি বিয়ে করেন নি। এম. এ. পাশ করার পর থেকেই কোন না কোনভাবে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত হলেও মা-বাবার পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করেছেন ; তবে শর্ত ছিল বেশ কয়েকটা। গরীবের ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে চাই ; নিতান্ত বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য একটি আংটি ও ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া কোন রকম উপহার নেওয়া হবে না ; মেয়েকেও সাধারণ দু'চারটি গহণা ছাড়া বিশেষ কিছু দিতে পারবেন না ; বরযাত্রী যাবে দশজন ; বৌভাবের অনুষ্ঠানেও ওরা দশজনের বেশি আসবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। মা-বাবা বোন-ভগ্নীপতিরা জানতো, এর কোন ব্যাপারে একটু এদিকে-ওদিক হলেই ও বিয়ের আসর থেকে চলে আসবে।

এইসব শর্তের জন্য দু'তরফই অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, সামাজিক বিয়ের সময় দু'পক্ষই যে অপব্যয় করেন বা করতে বাধ্য হন, তা বন্ধ হওয়া উচিত কিন্তু শংকর সরকার ছাড়া ক'জন সাহস করে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পারেন?

বিয়ের কিছুদিন পরই উনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, দেখ মনীষা, আমরা কেউই আকাশ থেকে পড়ি না। আমরা মা-বাবার সন্তান। ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতা আশীর্বাদ বা স্নেহে আস্তে আস্তে বড় হই। আমাদের বাড়িতে তারা যেন সম্মান ও মর্যাদা পায় ; আমাদের কারুর কাছ থেকে তারা যেন কোন দুঃখ না পায়।

মনীষা বি. এ. পাশ করার পরই ওর বিয়ে হয় কিন্তু বিয়ের পর শংকরবাবু দেখলেন, ও একেবারেই বইপত্তর পড়ে না। তার চাইতে গান শুনতে আর পাড়ার মেয়েবউদের সঙ্গে খোস গল্প করতেই ও বেশি ভালবাসে। কত ধৈর্য ধরে মাসের পর মাস বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পড়াশুনার অভ্যাস করাতে হয়েছে, তা শুধু ওর মা-বাবা আর বোনেরা জানে।

স্বামীর একটু নাম-ধাম হতেই মনীষা দেবীর নতুন বাতিক হলো-সুটিং এ যাবো আর নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো। শংকরবাবু হাসতে হাসতে ওকে বলেন, আমি যদি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কেরানী বা অফিসার হতাম, তাহলে কী তুমি ওখানে যেতে চাইতে মন্ত্রী-সেক্রেটারীদের সঙ্গে ভাব করতে?

—তা কেন চাইব?

—আমি যদি কোন হাসপাতালের ডাক্তার হতাম, তাহলে কী তুমি আমার রুগীদের দেখতে যেতে?

—কোন ডাক্তারের স্ত্রী আবার হাসপাতালে যায়?

শংকরবাবু হাসি চেপে বলেন, আমার কথা না হয় বাদই দাও। তুমি যদি কোন স্কুলের শিক্ষিকা বা কলেজের অধ্যাপিকা হতে, তাহলে কি আমি তোমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভাব করতে যেতাম?

—কোন দুঃখে তুমি তাদের সঙ্গে ভাব করতে যাবে?

—গুড!

উনি একটু থেমে বলেন, আসল কথা হচ্ছে, পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রকে জড়িয়ে ফেলা ঠিক না। তার পরিণতি সুখেরও হয় না, শান্তিরও হয় না।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মনীষা বলে, তোমার স্ত্রী হয়েও আমি কোনদিন স্টুডিও যাইনি বা কোন আর্টিষ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি শুনে আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত কত কথা বলে।

—ওদের খুশি করার জন্য এখন যদি তুমি স্টুডিও পাড়ায় যাতায়াত, আর্টিষ্টদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া শুরু করো, তাহলে তোমার ছেলেমেয়েরাও ত স্কুল পালিয়ে স্টুডিও পাড়ায় ঘুরাঘুরি করবেই। তখন মা হিসেবে তুমি কী খুব খুশি হবে?

এইভাবে ধীরে ধীরে উনি ওর স্ত্রীকে মনের মতন গড়ে তুলেছেন। মনীষা বই পড়ে, ভাল ভাল গানবাজনার অনুষ্ঠানে যায়, আর পাঁচজনের মত সিনেমা-থিয়েটারও দেখে। যখন খুশি সে আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি যায়, তারাও আসেন। বছরে দু'তিনবার কখনও কাছে কখনও দূরে, কখনও স্বামীর সঙ্গে, কখনও মা-বাবা বা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বেড়াতে যায়। বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর কেউ বলতে পারেনি, মনীষা সুখী না।

তারপর?

একে একে দুই মেয়ে মন্দাকিনী ও অলকানন্দা হয়েছে। কয়েক বছর পর এসেছে রুদ্রনীল।

ছোটবেলা থেকেই ওরা দাদু-দিদার কোলে বসে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনেছে। পড়েছে ঠাকুমার ঝুলি, আবোল-তাবোল আর কত ছড়া-গল্পের বই। মা ভাল ভাল গান শুনিয়েছেন, বাবার কাছে কত গল্প, কত কবিতা ছাড়াও কত মহাপুরুষের জীবনী আর বিস্ময়কর আবিষ্কারের কাহিনী শুনেছে। মা-বাবার সঙ্গে কত ঐতিহাসিক

জায়গা বেড়াতে গিয়েছে।

শংকরবাবু তিনজনকেই ভাল ভাল স্কুলে পড়িয়েছেন। বাল্যবন্ধু সন্তোষকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে ওদের পড়াতে রাজি করিয়েছেন। অলকানন্দার বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও বড় মেয়ে মন্দাকিনী ভারী সুন্দর কীর্তন আর রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের গান শিখেছে। স্কুলে প্রত্যেক বছর ভাল রেজাল্ট করে ক্লাসে উঠছে। দুই মেয়েই বেশ সুন্দরী কিন্তু বড় মেয়ে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে যেমন উদাসীন, ছোট মেয়ে ঠিক তত বেশি সচেতন। বারো-চোদ্দে বছর বয়সেই ও বেশ বুঝে গেছে, ও পরমা সুন্দরী। দিদির চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী হয়েও লেখাপড়ায় বিন্দুমাত্র উৎসাহী না। ফেল না করলেও কোন বিষয়েই ভাল নম্বর পায় না। তবে মেয়েটার অন্য অনেক গুণ আছে। বেশ সাহসী, কোন কাজ করতেই দ্বিধা নেই ; খেলাধূলায় বেশ ভাল, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে জানে। শুধু তাই না। এই বয়সেই বেশ ভাল গাড়ি চালাতে শিখে গেছে।

দাদু-দিদার জন্য ছেলেটা একটু বেশি আদুরে। মেয়েদের চাইতে মনীষা এই ছেলেকেই বেশি আদর দিয়ে মানুষ করে। ও কিছু চাইলে, কিছু দাবী করলেই হলো। ওর সেই দাবী, সেই ইচ্ছা পূরণ করবেনই।

এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়।

শংকর সরকারের খ্যাতি ও ব্যস্ততা দুইই বেড়েছে। আগে তিন-চার বছর অন্তর একটা ছবি করলেও এখন উনি প্রত্যেক বছর ছবি করেন। এর উপর আছে ভারত সরকার বা কোন টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য কাজ করা। এইসব ছবির কাজের জন্যই ওকে দেশের নানা জায়গায় যেতে হয়, থাকতে হয়। এছাড়া কখনও জুরি হবার জন্য, কখনও নিজের ছবির জন্য প্রতি বছর অন্তত দু'তিনবার বিদেশে যেতেই হয়। সব মিলিয়ে শংকরবাবু বছরের তিন শ' পয়ষট্টি দিনই ব্যস্ত।

এত কাজ করার জন্য ওর ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বেড়েছে অনেক। ইউনিটের প্রত্যেককেই এখন সারা বছর মাইনে দেন। ছ'সাতজন আর্টিষ্টকেও মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে রিটেনার দেন। শর্ত হচ্ছে, যখনই শংকরবাবুর দরকার হবে, তখনই ওদের কাজ করতে হবে। ছবির জন্য ওরা যে যার রেট মত টাকা পাবে। তপন পাল ত এখন অন্য কারুর ছবি বিশেষ করেই না। বলে, করব কেন? বাড়ি গাড়ি বহুকাল আগেই হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের জন্যও নেহাত খারাপ ব্যবস্থা করিনি। শংকরদার কাজ করেই যা আয় করি, তাতেই মহানন্দে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া ওর ছবিতে কাজ করে দেশে-বিদেশে যে সম্মান পাই, তা আর কার ছবিতে কাজ

করে পাওয়া সম্ভব? তবে হ্যাঁ, যে দু'একজন প্রডিউসার-ডিরেক্টর আমাকে প্রথম জীবনে সাহায্য করেছে, তারা অনুরোধ করলে না করতে পারি না। শর্মিষ্ঠা আর পরমা ত শুধু ওর ছবিতেই কাজ করে। বোম্বের দু'জন বিখ্যাত ডিরেক্টর বোম্বে থেকে কলকাতা এসে লাখ খানেক টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে কয়েক বছরের জন্য শর্মিষ্ঠার সঙ্গে চুক্তি করতে এসেছেন কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয়নি। ও হাসতে হাসতে তপনকে বলেছে, তপুদা, আমি বোম্বের কোন ছবিতেই কাজ করিনি কিন্তু যতটা শুনেছি, পড়েছি, তাতে জানি, খুব বিখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছু প্রডিউসার-ডিরেক্টর-হিরো আমাদের মত নতুন উঠতি অ্যাকট্রেশদের নিয়ে নিতান্ত খেয়াল-খুশি মত এনজয় করার পর ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। আমি কেন এই ফাঁদে পা দেব?

খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে শংকরবাবুর আয়ও অনেক বেড়ে গেছে। পরিবর্তন এসেছে পারিবারিক জীবনে। ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে থাকেন। পুরনো অ্যাম্বাসেডর বিক্রি করে নতুন অ্যাম্বাসেডর কিনেছেন বছর পাঁচেক আগেই। বছর তিনেক হলো নিজের ব্যবহারের জন্য কিনেছেন আর্মাডা। মনীষা বলেছিল, নিজের জন্যই যখন কিনলে তখন মারুতি কিনলে না কেন?

—আমাকে লোকেশান দেখতে আর আউটডোরের জন্য কখন কোথায় যেতে হয়, তার কী ঠিক আছে? আর্মাডা নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে পারব কিন্তু মারুতি নিয়ে কী জল-কাঁদার রাস্তায় যাওয়া যায়?

—তা ঠিক কিন্তু একজন মানুষের জন্য স্টেশন ওয়াগন ধরনের...

মনীষা কথাটা শেষ করার আগেই শংকরবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি একলা একলা গাড়ি চড়ার সুযোগ আর পাই কোথায়? অধিকাংশ সময়ই ত ইউনিটের দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়।

—তোমার মাথায় সব সময় কত চিন্তা-ভাবনা। নিজে না চালিয়ে কেষ্টকেই ত রাখলে পারতে। আমাদের অ্যাম্বাসেডরের জন্য না হয় নতুন কোন ড্রাইভার...

—না, না, তা হয় না।

শংকরবাবু একটু থেমে বলেন, দুটো মেয়েই বড় হয়েছে। নতুন ড্রাইভার রাখা ঠিক হবে না।

উনি একটু থেমে বলেন, কেষ্ট পুরনো লোক। আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি চেনে। ও থাকলে তোমাদের সবারই সুবিধে হবে।

—মা-বাবারও অবশ্য তাই মত।

শংকরবাবু কলকাতায় থাকলে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও রাত্রে সাড়ে ন'টা-পৌনে

দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরবেনই। দিনে সম্ভব হয় না কিন্তু রাত্রে এ বাড়ির সবাই এক সঙ্গে খায়। এটাই এ বাড়ির নিয়ম, ধারা। দশটায় খাওয়া-দাওয়া শুরু হলেও নানা কথাবার্তা গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টার জন্য কেউই ঘণ্টা খানেকের আগে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠতে পারে না। শংকরবাবুর বাবা বলেন,এই ডাইনিং টেবিল পার্লামেন্টের জন্যই আমরা তিন পুরুষ হেসেখেলে এক সঙ্গে থাকতে পারছি।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আজকাল ত তিন পুরুষকে এক সঙ্গে থাকতে দেখাই যায় না। ঠাকুরের কৃপায় আমরা সেদিক দিয়ে সত্যি ভাগ্যবান।

শংকরবাবু হাসতে হাসতে বাবাকে বলেন, একটু ধৈর্য ধরুণ। আর ক'দিন পরই আমরা চার পুরুষ এক সঙ্গে খাবো।

মন্দাকিনী আর অলকানন্দা সলজ্জ চাপা হাসি হাসতে হাসতে উঠে যেতেই সেদিনের মত সরকার পরিবারের ডিনার পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হয়।

সময় আপন গতিতে এগিয়ে যায়।

মন্দাকিনী পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম. এ. পড়ছে। অলকানন্দা কোন মতে মাধ্যমিক পাশ করে ইলেভেনথ্ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। ছেলে পড়ছে ক্লাশ সেভেনে।

ঝাড়গ্রামের ওদিকে লোকেশন দেখার জন্য ভোর পাঁচটায় বেরুবার সময়ই শংকরবাবু মা-বাবাকে বললেন, খুব চেষ্টা করব রাত্রে খাওয়া-দাওয়া আগেই ফিরতে। তবে আমার ফিরতে দেরি হলে তোমরা খেয়ে নিও।

ওর মা বললেন, গরম কালের দিন ; আধঘণ্টা-এক ঘণ্টা পরে খেতে বসলেও আমাদের কষ্ট হবে না।

—না, মা, দশটাতেই ঠিক খেতে বসো। এতদিনের এই নিয়ম ভাঙা ঠিক না।

ঘড়ির দিকে একবার চোখ ফিরিয়েই উনি মা-বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে যান। গাড়িতে ষ্টার্ট দিতেই বড় মেয়ে মনীষা পাশে দাঁড়িয়ে বলে, বাবা, সাবধানে চালিও।

শংকরবাবু একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ মা, সাবধানেই চালাবো।

রাত সওয়া দশটায় ফিরে এসে অলকানন্দা ছাড়া আর সবাইকে খেতে দেখেই শংকরবাবু মনীষার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার ছোট মেয়ের কী খাওয়া হয়ে গেছে?

—না, না ; ও এক বন্ধুর বাড়ি নোটস্ টুকতে গেছে।

—তাই বলে রাত সাড়ে দশটাতেও বাড়ি ফিরবে না?

—গিয়েছেই ত সন্ধের পর।

শংকরবাবু বেশ বিরক্ত হয়েই বলেন, সন্ধের পর যায় কেন?

উনি এক নিঃশ্বাসেই বলেন, ও কী এই বাড়ির নিয়ম-কানুন ভুলে গেছে?

মনীষা স্বামীর মেজাজ বুঝতে পেরেই চুপ করে যান।

ওর শাশুড়ি ছেলেকে বলেন, তুই ক্লান্ত হয়ে এসেছিস। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আয়। ও এখুনি এসে পড়বে।

—আমি এখন চান না করে খেতে পারব না। তাছাড়া মেয়েটা ফেরার আগে আমি খেতে বসব না।

উনি পৌনে এগারটা নাগাদ বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখেন, ছোট কন্যা ঢুকছেন। কোন ভূমিকা না করে উনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ক'টা বাজে?

অলকানন্দা হাতের ঘড়ি দেখেই বলে, দশটা চল্লিশ।

—কোন ভদ্রবাড়ির মেয়ে এইসময় বাড়ি ফেরে?

ও মুখ নীচু করে বলে, আর কোনদিন হবে না।

মেয়েকে আর কোন কথা না বললেও উনি ড্রাইভারকে ডেকে বলেন, কেষ্ট, একটা কথা বলে যাচ্ছি। দাদু-দিদা আর কাকিমা ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে বেরুলেই সন্ধে সাতটার মধ্যে গাড়ি গ্যারাজে রেখে দিতে হবে। কোন কারণেই যেন এর ব্যতিক্রম না হয়।

কেষ্ট মুখ নীচু কর বলে, না, স্যার, হবে না।

ভোর পাঁচটা নাগাদ টেলিফোন!

—মিঃ সরকার, আমি ষ্টেটস্‌ম্যান নিউজরুম থেকে বলছি। কনগ্রাচুলেশনস্!

শংকরবাবু অবাক হয়ে বলেন, ফর হোয়াট?

—ভোর তিনটেয় রয়টারের খবর এলো, লন্ডন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে আপনি বেষ্ট ডিরেক্টর আর বেষ্ট স্ক্রীন-প্লে রাইটার...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, রিয়েলী?

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আরো সুখবর আছে। আপনার 'শ্রীমতী রাধা' ছবির হিরোইনও দুটো অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। শর্মিষ্ঠাকে ওরা দিচ্ছে, বেষ্ট হিরোইন আর মোষ্ট বিউটিফুল হিরোইন...

—ও মাই গড! এ ত বিশ্বাসই করতে পারছি না।

—আজকের কাগজের প্রথম পাতায় আপনাদের দু'জনের ছবি দিয়ে খবরটা ছাপা হয়েছে। বাই দ্য ওয়ে আপনাদের দু'জনকেই ত লন্ডন যেতে হবে। গেট রেডি।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখেই শংকরবাবু গাড়ির চাবি হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনীষা জিজ্ঞেস করেন, টেলিফোনে কী খবর শুনলে যে এই

মুহূর্তেই গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছে?

উনি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, এসে সব বলছি।

শংকরবাবু ষ্টেটস্‌ম্যানের প্রথম পাতা দেখে মুগ্ধ। তিন কলাম হেডিং—শংকর, ওয়ার্ল্ডস্ বেষ্ট ডিরেক্টর অ্যান্ড স্ক্রীন প্লে রাইটার। খবরটা বেশ বড়। উত্তেজনায় পড়তে পারলেন না। শুধু ওর আর শর্মিষ্ঠার ছবি দেখেই দশখানা কাগজ কিনে নিলেন। অত ভোরে যে যে কাগজ পাওয়া গেল, সেগুলোও দু'কপি করে কিনে নিয়েই সোজা কালীঘাট। মা কালীকে প্রণাম করেই বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন শর্মিষ্ঠার ফ্ল্যাটে।

বোতাম খোলা নাইটি কোনমতে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে শর্মিষ্ঠা দরজা খুলতেই পলকের মধ্যে শংকরবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করেই দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলেন, তুমি পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দরী আর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী!

—কী বলছ শংকরদা?

এক খানা ষ্টেটস্‌ম্যান ওর হাতে দিতেই শর্মিষ্ঠা এক ঝলক দেখেই দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরেই চুমু খেতে খেতে লুটিয়ে পড়ে বলে, এ আমার স্বপ্নের বাইরে। সবই তোমার কৃপায়!

—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। খবরটা একটু পড়ি।

শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়িয়েই ওর একটা হাত ধরে টান দিয়ে বলে, এসো, ভিতরে যাই।

শর্মিষ্ঠার বিছানায় খবরের অর্ধেক পড়েই শংকরবাবু বলেন, আমাদের দু'জনকেই শনিবার বা রবিবার লন্ডন রওনা হতে হবে।

—সত্যি আমাকেও যেতে হবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেও যেতে হবে।

শংকরবাবু এইকথা বলেই উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমি যাচ্ছি। কয়েকটা কাগজ রেখে যাচ্ছি। পড়ে দেখ।

বাড়িতে পৌঁছেই শংকরবাবু চিৎকার করেন, মা! মা! দারুণ খবর আছে।

বৃদ্ধা ছুটে এসে বলেন, কী খবর আছে?

মাকে প্রণাম করেই বলেন, বাবা কোথায়? বাবাকে ডাকো। মনীষা!

বাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরুতেই শংকরবাবু ওকে প্রণাম করেন। মনীষা উত্তেজিত হয়ে বলেন, আগে খবরটা বলো।

উনি মুখে কিছু না বলে একখানা ষ্টেটস্‌ম্যান ওদের সামনে খুলে ধরেন।

আনন্দ খুশির বন্যা বয়ে গেল বাড়িতে। এদের উত্তেজনা আর চেঁচামিচিতে

ছেলেমেয়েরা বিছানা ছেড়ে উঠে এসেই কাগজ দেখে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

মনোরমা চা নিয়ে আসতে না আসতেই শুরু হলো টেলিফোন আর পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের ভীড়।

ঠিক ন'টার সময় ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারীর ফোন—মিঃ সরকার, দিস ইজ জন ব্রাইট। কনগ্রাচুলেশানস!

—ধন্যবাদ।

—মিঃ সরকার, ডেপুটি হাই কমিশনার দু'তিনজন সঙ্গী নিয়ে এখুনি আপনার কাছে আসতে আগ্রহী।

—হি ইজ মোষ্ট ওয়েলকাম কিন্তু আমার বাড়ি কী আপনারা চিনবেন?

—ক্যালকাটা পুলিশ কমিশনার আমাদের এসকর্ট করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।

—দ্যাটস ফাইন।

—সো ইউ ক্যান এক্সপেক্ট আস উইদিন ফিফটিন ফিনিটস্!

টেলিফোন নামিয়ে নামিয়ে রেখেই উনি স্ত্রীকে বলেন, মনীষা, চট করে কাপড়-চোপড় বদলে নাও। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার তিন-চারজনকে নিয়ে দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই আসছেন।

মনীষা এক মুহূর্তের জন্য ভিতরে গিয়ে সবাইকে খবরটা জানিয়ে মন্দাকিনীকে বলেন, তোরা দুই বোন কফি-টফি দেবার সব ব্যবস্থা কর। আমি চট করে কাপড়টা বদলে নিই।

শংকরবাবু আগেই তৈরি ছিলেন। মনীষা কাপড়-চোপড় বদলে কপালে টিপ পরছে, ঠিক সেই সময় পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ!

—মনীষা, এসো এসো।

টালিগঞ্জের এই ক্ষেত্র মোহন নস্কর রোডের গলির মধ্যে পুলিশের গাড়ির ঘন ঘন সাইরেনের আওয়াজে সারা পাড়ায় লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসেন। এক মিনিটের মধ্যে পুলিশের পাইলট কার শংকরবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েই একটু এগিয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে ডেপুটি হাইকমিশনারের গাড়ি ঠিক ওর বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। পিছনেই ওদের আরো দুটি গাড়ি।

চারজন গাড়ি থেকে নামতেই সরকার দম্পতি বারান্দা থেকে নেমে আসেন।

ডেপুটি হাই কমিশনার ওদের দু'জনের হাতে দুটি বোকে দিয়েই বলেন, অন বিহাফ অব হার ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্ট, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

ওর পরই আরো একজন ওদের হাতে দুটি বোকে দিতেই মিঃ ব্রাইট বলেন, দিস ইজ মিঃ লংম্যান, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইষ্ট এশিয়ার রিজিওন্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ!

সবাই মিলে ড্রইংরুমে বসতেই ডেপুটি হাই কমিশনার শঙ্করবাবুর হাতে একটা খাম দেন।

চিঠিটার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই শংকরবাবু একটু হেসে বলেন, অশেষ ধন্যবাদ। এ ত দারুণ সম্মানের ব্যাপার।

—মিঃ সরকার, এই ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল শুধু ইন্ডাষ্ট্রি অর্গানাইজ করেনি। হার ম্যাজেষ্টিস গভর্নমেন্টের ফরেন অফিস আর কমনওয়েলথ রিলেসান্স আফিসও জড়িত ছিল।

ডেপুটি হাই কমিশনার একটু থেমে বলেন, এইরকম ঐতিহাসিক ফেষ্টিভ্যালে আপনার মত গুণী যে যথাযথভাবে সম্মানিত হয়েছে, তার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট ও ব্যক্তিগতভাবে আমি যেমন খুশি, তেমনই গর্বিত। আপনাকে ও আপনার হিরোইনকে অতিথি হিসেবে পেলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

এর পর মিঃ লংম্যান ওর হাতে একটা সুন্দর ফোল্ডার তুলে দিয়ে বলেন, যদি কাইন্ডলি আপনারা দু'জন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের গেষ্ট হয়ে ট্রাভেল করেন, তাহলে আমরা ধন্য হবো।

শংকরবাবু বলেন, আমার ছবি পুরস্কৃত হলেও সব সময় সব জায়গায় আমার উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু এই ফেষ্টিভ্যাল সত্যি হিস্টোরিক। আমি নিশ্চয়ই যাব।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, হার ম্যাজেষ্টিস গভর্নমেন্টের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমি নিজেকে সত্যি ধন্য মনে করছি।

মিঃ লংম্যান ও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজকেও উনি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানান।

মিঃ ব্রাইট বলেন, আমি এখান থেকে অফিসে ফিরেই আপনার হিরোইন মিস সারমিস্টের কাছে যাব।

—ইফ ইউ ওয়ান্ট আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

—আপনার অসুবিধে না হলে...

—না, না, কোন অসুবিধে হবে না।

পরবর্তী পাঁচটা দিন অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেওয়া ও রেডিও-টি. ভি. র রেকর্ডিং আর উদ্যোগ আয়োজনে কেটে যাবার পর শঙ্করবাবু শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে লন্ডন রওনা হলেন।

সব মিলিয়ে লন্ডনের দিনগুলো স্বপ্নের মত কেটে গেল। শর্মিষ্ঠার এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। আবার কবে সুযোগ আসবে, ঠিক নেই। তাই শংকরবাবু ওকে কয়েক দিনের জন্য প্যারিস আর জেনেভা ঘুরিয়ে আনলেন। তারপর আবার সেই কলকাতা।

বাড়ি ফিরে মনীষাকে দেখেই শংকরবাবু স্তম্ভিত। বলেন, তোমার এত শরীর খারাপ অথচ আমাকে খবর দাওনি কেন?

বাড়ির পরিবেশ থমথমে দেখে বলেন, তোমরা সবাই এমন চুপ করে আছো কেন? ডাঃ দাস কী কোন খারাপ অসুখের কথা বলেছেন?

তবু মনীষা কিছু বলে না। মুখ নীচু করে বসে থাকে।

শংকরবাবু একটু গলা চড়িয়ে বলেন, কিছু বলবে ত? বলো কি হয়েছে।

মনীষা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেই বলেন, তোমার ছোট মেয়ে কেষ্টর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে?

—কবে?

—তুমি যাবার দু'দিন পর।

মন্দাকিনী কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা, ওরা বিয়েও করেছে।

যে চিত্রনাট্যকার অসংখ্য চরিত্রের লক্ষ লক্ষ্য সংলাপ লেখার জন্য সর্বত্র বন্দিত, তিনি তার পারিবারিক জীবননাট্যের এই সন্ধিলগ্নে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না। বোবা হয়ে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেরুচ্ছি। জরুরী কাজ আছে। ফিরতে নিশ্চয়ই রাত হবে।

শর্মিষ্ঠা দরজা খুলেই অবাক হয়ে বলে, তুমি? এখনই? বাড়িতে যেতে না যেতেই চলে এলে?

শংকরবাবু ঘরের মধ্যে পা দিয়ে বলেন, তুমি একটু থাকতে দেবে? ঠিক কখন বাড়ি ফিরব, তা কিন্তু বলতে পারছি না।

ও একটু হেসে বলে, হাসি মুখে যাকে আমি সর্বস্ব দিয়ে সব চাইতে আনন্দ পাই, যার জন্য আমার খ্যাতি-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি, যার ভালবাসায় আমি ধন্য, তাকে থাকতে দেব না।

সামনের সোফায় ধপাস করে বসে পড়েই শংকরবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, চরিত্র-পরিস্থিতি-প্রয়োজনীয়তা-স্বাভাবিকতার কথা মনে রেখেই আমি

চিত্রনাট্য আর সংলাপ লিখি। দর্শক-সমালোচকরা বলেন, কাহিনী চরিত্র পরিস্থিতি ইত্যাদি সামঞ্জস্য বজায় রেখে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখি বলে আমার ছবিগুলো সমাজের এক এক অংশের সার্থক প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

—আমার স্বপ্ন, আমার চিন্তা, পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্টিস্ট-ক্যামেরাম্যান-টেকনিসিয়ানদের যাকে যা বলি, সে তাই করে। তোমাকেও ত যা বলছি, তাই করেছ।

একবার নিঃশ্বাস নিয়ে উনি বলে যান, তোমার ঠিক আঠারো বছর বয়সে তোমাকে আমি অসভ্য বেপরোয়া অশ্লীল পতিতা করেছি 'অচেনা শহর' ছবিতে। অন্যান্য ছবিতে তোমাকে দিয়ে কত বিচিত্রভাবে কাজ করিয়ে নিয়েছি। সবাই আমার কথা শুনেছে। সহযোগিতা করেছে বলে ছবিগুলো করে আমি মনে মনে তৃপ্তি পেয়েছি।

শংকরবাবুকে এমন গম্ভীর চিন্তিত দেখে, গুরুগম্ভীর কথাবার্তা শুনেই শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে, কিছু অঘটন ঘটেছে। তাই চুপ করে থাকে।

শংকরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সব মানুষই তার জীবন, তার পরিবার সম্পর্কেও মনে মনে একটা চিত্রনাট্য রচনা করে। নিজেকে, নিজের সংসারকেও পরিচালনা করার জন্যও একটা পরিকল্পনা থাকে মনের মধ্যে।

হঠাৎ উনি একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, সেই চিত্রনাট্য, পরিচালনার পরিকল্পনা কেউ বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না। কিছুতেই হবে না। কখনই হবে না।

শংকরবাবুর ওর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলেন, বুঝলে শর্মি, সার্কাসের বাঘের সঙ্গে সুন্দরবনের জঙ্গলের বাঘের যে পার্থক্য, সিনেমার সঙ্গে আমাদের জীবনের পার্থক্যও ঠিক সেইরকম।

বন্যেরা বনে সুন্দর...

তখনও পুরো জ্ঞান ফেরেনি, দুটো চোখই বন্ধ করে আছে। একটু আচ্ছন্নের ভাব কিন্তু তবু ব্যথায় কাতরাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। চোখে দেখা যায় না। জয়-এর দাদা বৌদি আর ছোড়দির চোখে জল এসে যায়। ডাঃ সেন সকালে বলেছেন, ক্রাইসিস ইজ ওভার কিন্তু তবু ওদের ভয়ের শেষ নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় সবারই বুক কাঁপে কিন্তু মুখে কেউই তা প্রকাশ করেন না।

শীলা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্বামীকে বলে, এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না। তুমি একবার সিষ্টারকে বলো না।

—হ্যাঁ যাচ্ছি।

অজয় এক মুহূর্ত দেরি না করে সাত নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শীলা বলে, আমি যে জয়কে কতদিন বলেছি অত স্পীডে মোটর সাইকেল না চালাতে, তার ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু......

ছোড়দি বললেন আমিও ওকে হাজারবার বারণ করেছি কিন্তু সব সময় ওর এক কথা, ছোড়দি, এটা সাইকেল না, মোটর সাইকেল। আস্তে চালালে এর জাত যাবে।

—হ্যাঁ সব সময় ওর মুখে এক কথা। শীলা একটু থেমে একটু হেসে বলে, আমাকে নিয়ে বেরুলে ত বেশী জোরে চালাতে পারতো না। তাই সব সময় আমাকে বলতো, তুমি এবার থেকে জীন্স পরে আমার মোটর সাইকেলে উঠবে, নয়তো জোরে চালানো যায় না।

অজয় পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকতেই শীলা আর ছোড়দি প্রায় এক সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, সিষ্টার আসছে?

অজয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, মহারাণী বললেন, ব্যথা ত করবেই।

—ব্যস! ছোড়দি অবাক হয়ে বলে, তাই বলে ওদের কিছু করণীয় নেই?

—তুমি ভাবতে পারবে না ছোড়দি, এই সিষ্টার কি বিচ্ছিরিভাবে কথাবার্তা বলে। অজয় একটু থেমে একবার ভাল করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, এই রকম একটা সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট কেসের পেসেন্টের জ্ঞান ফেরার সময় সে ব্যথায় ছটফট করবে, তা সবাই জানে কিন্তু ওষুধ ইনজেকসান তো আছে।

মেজদি বলে, সে তো একশবার।

—তাছাড়া কথা বলারও একটা ধরন আছে ত! এই ভদ্রমহিলা এমন বিচ্ছিরিভাবে কথাবার্তা বলেন যে......

স্বামীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শীলা বলে, অথচ সকালে যে সিষ্টার ডিউটিতে ছিলেন, তার ব্যবহার কথাবার্তা কী সুন্দর।

অজয় বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ মেয়েটির ব্যবহার কত ভালো। আজ তিনদিন ধরে ত দেখছি...

জয়-এর কত জায়গায় যে কেটেকুটে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই কিন্তু সব চাইতে বেশি চোট লেগেছে ডান হাতে আর ডান পায়ে। ডান পায়ের নীচের দিকে দু' জায়গায় ফ্রাকচার হয়েছে। ডান হাতের কনুইয়ের একটু উপরই হাড় ভেঙ্গেছে। তাছাড়া ডানদিকে উবুর ওখানটা দারুণভাবে কেটে গেছে। শুধু ওখানেই চোদ্দটা ষ্টিচ হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মাথায় বা বুকে তেমন কিছু চোট লাগেনি। তবে দুচারটে করে ষ্টিচ শরীরের অনেক জায়গাতেই করতে হয়েছে। জয়-এর প্রায় সারা শরীরটাই ব্যাণ্ডেজ আর প্লাষ্টার দিয়ে ঢাকা। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। ওকে যখন অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আনে, তখন ত ওকে দেখে সবার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ডাঃ সেন অবশ্য বলেছিলেন, আই থিঙ্ক হি উইল বী অল রাইট তবে টাইম লাগবে কিন্তু তবু আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। মনে মনে সবাই আশঙ্কা করেছিলেন এমন সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্টের পর পেসান্টের অবস্থা কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। আজ সকালে ডাঃ সেনের কথা শুনে সবাই অনেকটা আশ্বস্ত হলেও কেউই ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। অজয় ত ওর বাবাকে শুধু বলেছে, পায়ে একটা ফ্রাকচার হয়েছে আর দু একটা জায়গায় সামান্য কেটেকুটে গেছে। উনি হাসপাতালে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওকে বলা হয়েছে, শুধু শুধু আপনি কেন কষ্ট করবেন? জয় ত ভালই আছে। ভাগ্য ভালো ওদের মা এখন দিল্লীতে বড় মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছেন। উনি এখানে থাকলে কি যে হতো তা ভাবা যায় না।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টা বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেজেছে কিন্তু ওরা তিনজনে এখনও জয়-এর কাছে রয়েছে। বেচারা ব্যথায় এত কাতরাচ্ছে যে ওরা ওকে ছেড়ে যেতে পারছেন না। হঠাৎ সিষ্টার ইনজেকশন দেবার জন্য কেবিনে ঢুকে ওদের দেখেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এ কি! আপনারা এখনও রয়েছেন? ডাক্তাররা রাউণ্ডে এসে আপনাদের দেখলে আমাদেরই বকুনি খেতে হবে।

অজয় বলে, আমরা যাচ্ছি।

—হ্যাঁ যান। সিষ্টার আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জয়-এর হাতে সিরিঞ্জের নিডল্‌টা ঢুকিয়ে দেয়। ছোড়দি কেবিন থেকে বেরিয়েই শীলাকে বলে, কী নির্মমভাবে ছুঁচটা ঢোকাল দেখলে?

—এর কথা আর বলো না। একে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

পরের দিন সকালে গিয়ে শীলা সেই ভালো নার্সটির সঙ্গে দেখা হতেই বলল, বিকেলের দিকে যে সিষ্টারটি ডিউটিতে থাকেন, তাকে দেখলেই আমাদের ভয় করে।

—কেন? উনি হেসে জিজ্ঞেস করেন।

—ভাই, ওর বড্ড মেজাজ।

উনি আবার হেসেই জবাব দেন ও একটু কড়া আছে ঠিকই কিন্তু ও সত্যি খুব ভাল নার্স।

—তা হতে পারেন কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনলে পেসেন্টদের আত্মীয় স্বজনদের খুব খারাপ লাগে।

—দেখছেন ত আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। সব সময় মেজাজ ঠিক রাখাও যায় না। সিষ্টার জয়-এর টেম্পারেচার দেখতে দেখতে বলেন, যাই হোক, কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া আপনার দেওর ত আস্তে আস্তে ভালই হচ্ছেন।

—শীলা একটু হেসে বলে, ভাই, আপনি একটু দেখবেন। আমরা কিন্তু আপনাকেই বিরক্ত করব।

—না, না, বিরক্ত হবার কী আছে? যতটা পারবো নিশ্চয়ই করবো। সিষ্টার একটু থেমে শীলার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি যদি একটু বাইরে যেতেন তাহলে এখনই আমি ড্রেস করে দিতাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। শীলা একটু হেসে বলে, তাছাড়া টাইমও ত হয়ে গেছে।

প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজে জয়-এর প্রায় সারা শরীরটা ঢেকে গেছে। কোন জামা-কাপড় পরাবার উপায় নেই। গলা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢাকা আছে। সিস্টাররা চাদর একটু সরিয়ে ষ্টিচের জায়গাগুলো ড্রেস করেন। সময়ও লাগে প্রায় ঘণ্টা খানেক। জয়-এর জ্ঞান ফিরলেও এখনও বেশ আচ্ছন্নে ভাব। কানের কাছে মুখ নিয়ে বার কয়েক ডাকাডাকি করলে চোখ বুজেই জবাব দেয়। কদাচিৎ কখনও দু' একটা কথা বলে। তার বেশী কিছু নয়। সিস্টাররা কখন ওকে ওযুধ খাওয়াচ্ছে বা ড্রেস করছে, তা ও জানতেও পারে না।

এই ভাবেই আরো ক'টা দিন কেটে গেল। জয়-এর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার সিস্টার বা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশ কথাবার্তাও বলে। ডাক্তার সিস্টারদের সঙ্গে বাড়ির লোকজনদেরও বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। ডাঃ সেন ত কালকে অজয় আর শীলার সামনেই জয়কে বললেন, প্রথম তিন চারদিন ত আপনার দাদা-বৌদি আমার কথার উপরও আস্থা রাখতে পারেন নি। এখন আপনিই ওদের বলে দিন কেমন আছেন।

—আমরা ত লে-ম্যান, তাই...। অজয় আমতা আমতা করে বলে।

এখন 'ভাল' নার্স কেবিনে ঢুকলেই শীলা বলে, ভাই বাসন্তী, আমাদের হিরো

বাড়ী ফিরলে তোমাকে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসতে হবে।

বাসন্তী হেসে বলে, আমরা হাসপাতালের মানুষ হাসপাতালেই থাকি। কোন পেসেন্টের বাড়ী যাই নি।

—না, না, বাসন্তী, ওসব কোন ওজর আপত্তি আমরা শুনব না।

ছোড়দি বলে, না গেলে আমি পাকড়াও করে নিয়ে যাবো।

জয়কে ওষুধ দিয়ে বাসন্তী হাসতে হাসতে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টাখানেক পর বাসন্তী আবার সাত নম্বর কেবিনে আসে জয়কে ইন্জেকশান দেবার জন্য। ওকে দেখেই জয় জিজ্ঞাসা করে, শত খানেক ইন্জেকশআন ত নিলাম। আর কত ইন্জেকশান দেবেন?

বাসন্তী একটু হেসে বলে, আপনি যত স্পীডে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তার চাইতে কম ইন্জেকশানই দেওয়া হয়েছে।

জয় একটু হেসে বলে, দেখছি, মোটর সাইকেলটার উপর আপনারও যথেষ্ট রাগ।

—হবে না? কী সুন্দর অবস্থায় এসেছিলেন, তা তো জানেন না। বাসন্তী ইন্জেকশানটা দিয়ে বলে, আর জীবনে মোটর সাইকেল চড়বেন না।

—চড়ব না?

—নেভার।

—কেন?

—কেন জানি না। চড়তে বারণ করলাম, চড়বেন না। বাসন্তী কথাটা শেষ করেই কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

জয় শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে। হাসপাতালে কত অ্যাকসিডেন্ট কেসই তো আসে কিন্তু কোন পেসেন্টকে কোন নার্স কী এই ধরনের পরামর্শ দেয়? না, কখনও ত শুনি নি। পেসেন্টদের পরামর্শ দেওয়া ত নার্সদের কাজ না। তবে কী............

একটু পরেই বাসন্তী আবার ওর কেবিনে আসে। জিজ্ঞেস করে, আপনার কাছে অনেক বই আর ম্যাগাজিন আছে। কাল আমার অফ ডে। একটা বই দেবেন?

—কাল অফ ডে?

—হ্যাঁ ; পরশু থেকে নাইট ডিউটি।

—কাল মর্নিং এ কার ডিউটি?

—নমিতার।

—বিকেলে? জয় সঙ্গে বলে, গীতাদির?

—হ্যাঁ।

কয়েকটা মুহূর্ত কেউই কোন কথা বলে না। তারপর জয় জিজ্ঞেস করে, আজ রাত্তির ন'টা-সাড়ে ন'টায় যাবেন আর পরশু দিন সেই রাত্তিরে আসবেন?

—হ্যাঁ ; কেন? বাসন্তী একটু হেসে জিজ্ঞেস করে।

আপন মনে কি একটু ভেবে জয় প্রশ্ন করে, কাল সারাদিনের মধ্যে একবারও আসবেন না?

—ডিউটি না থাকলে আসবো কেন?

পরের দিন অফ ডিউটি থাকলেও বাসন্তীকে আসতে দেখেই গীতাদি জিজ্ঞেস করেন, কিরে তুই এখন?

—সাত নম্বর কেবিনে এই বইটা ফেরত দিতে এলাম।

—ও! গীতাদি আর কোন কথা না বলে দু'নম্বর কেবিনে যান।

বাসন্তীকে কেবিনে ঢুকতে দেখেই জয় এক গাল হাসি হেসে বলে, দেখছি আমার সত্যিই উইল পাওয়ার আছে।

—তার মানে?

—তার মানে আর শুনতে হবে না।

বাসন্তী একটু চাপা হাসি হেসে বলে, আজ নিশ্চয়ই অনেকে দেখতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, আজ রবিবার বলে অন্ততঃ পঁচিশ-তিরিশ জন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির।

ঐ চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বাসন্তী বলে, তবু উইল পাওয়ার পরীক্ষার দরকার হলো?

জয় ওর দিকে মৃদু দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—আমি পাঁচ বছর এই হাসপাতালে চাকরি করছি। আজই প্রথম অফ ডিউটিতে ওয়ার্ডে ঢুকলাম।

জয় খুশির হাসি হেসে বলল, যাক, রোগটা তাহলে শুধু আমার না।

* * *

জয় ডিসচার্জ হবার পর রোজই বাসন্তী ভাবে, ওদের বাড়িতে যাওয়া কী ঠিক হবে? হাজার হোক এরা সবাই বেশ উচ্চ শিক্ষিত এবং বেশ পয়সাওয়ালা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ত কাউকেই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মনে হয় নি। আর আমি? আমি সরকারী হাসপাতালের একজন সাধারণ নার্স। মাইনে পাবার পরের অফ ডে'তেই আমাকে হাওড়া থেকে কাটোয়া লোক্যালে চেপে জিরাট যেতে হয় মা-র হাতে টাকা পৌঁছে দেবার জন্য।

বাসন্তী মনে মনে আরো কত কি ভাবে। নিজের মনেই নিজেকে বোঝায়, আমি ত নিজে চাই নি। ওরা সবাই ত হাজার বার আমাকে যেতে বলেছে। না গেলে নাকি ওরা...

শেষ পর্যন্ত পরের অফ ডে'তে বাসন্তী জয়দের বাড়িতে না গিয়ে পারল না। একটা চাকর এসে দরজা খুলে ড্রইং রুমে বসতে দিয়ে বলল, আপনি বসুন। আমি উপরে খবর দিচ্ছি।

পাঁচ-সাত মিনিটে পর শীলার গলা ভেসে আসে, ছোড়দি, হাসপাতালের সেই নার্স নাকি সত্যি সত্যিই এসে হাজির হয়েছে।

—তুমি যাও ; আমি এখন যেতে পারবো না।

ছোড়দির জবাবটা স্পষ্ট শুনতে পায় বাসন্তী। পিঠে যেন পর পর দুটো চাবুকের আঘাত পড়ল। না, বাসন্তী আর এক মুহূর্ত দেরী না করে নিঃশব্দে ও বাড়ি থেকে

বেরিয়ে যায়।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। রাসবিহারী এভিন্যুর ট্রাম স্টপেজের কাছাকাছি হঠাৎ জয়ের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তিন-চারজন বন্ধু বান্ধব। জয় ওকে দেখেই অবাক হয়ে বলে, আরে, আপনি এ পাড়ায়!

—হ্যাঁ, এক বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম।

—ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ ; আপনি?

জয় এক গাল হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, পারফেক্টলি অল রাইট।

হঠাৎ একটা মিনিবাস আসতেই বাসন্তী তাতে উঠে পড়ে।

*　　　　*　　　　*

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের ঐ অন্ধ গলির শেষ বাড়ির দরজায় খট্ খট্ করে কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে একজন মহিলা প্রায় চিৎকার করে বললেন, যাই।

এক মিনিট পর বৃদ্ধা দরজা খুলতেই বাসন্তী তাঁকে প্রাণাম করে।

বৃদ্ধা দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে এক গাল খুশির হাসি হেসে বললেন, এতদিন পর আমাকে মনে পড়ল?

বাড়ির উঠানে পা-দিয়েই বাসন্তী বলে, কী করব মাসীমা? সারা সপ্তাহ ডিউটি করার পর অফ ডে'তে আর বিশেষ বেরুতে ইচ্ছে করে না।

—জানি মা ; তোমাদের বড্ড খাটুনি। খোকার কাছে ত সব শুনি।

—মেশোমশাই আর সন্তোষদা বাড়ি আছেন তো?

—না মা ; তোমার মেসোমশাই গতকাল বড় মেয়ের বাড়ি গিয়েছেন। আজ রাত্তিরেই ফিরে আসবেন। আর খোকাকে একটু দোকানে পাঠিয়েছি। এখুনি এসে যাবে।

সত্যি মিনিট খানেকের মধ্যেই সন্তোষ ফিরে আসে। রান্নাঘরের দোর গোড়ায় মোড়ার উপর বাসন্তীকে বসে থাকতে দেখেই চিৎকার করে, মা, মোড়ার উপরে কী ভূত বসে আছে?

বাসন্তী একটু হেসে বলে, না, পেত্নী।

একটু কাছে এসে সন্তোষ বলে, হাসপাতালের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের এক সামান্য কর্মচারীর বাড়িতে তুমি আসতে পারলে?

—আমি কী মেডিক্যাল সুপারিটেনডেন্ট?

সন্তোষের মা কড়ায় তরকারী চাপাতে চাপাতেই বলেন, ও এই বাড়িতে আসবে না মানে? এইটাই ত ওর আসল বাড়ি। বৃদ্ধা আপন মনেই একটু হেসে বলেন, সামনের অঘ্রানেই ওকে আমি এ বাড়িতে পাকাপাকিভাবে নিয়ে আসছি।

লজ্জায় বাসন্তীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। ও একটু সামলে নিয়েই সন্তোষকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা সঞ্জীব চ্যাটার্জীর কোন বইতে যেন আছে "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে?"

—পালামৌ।